ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগের শেষ কবি, সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বস্তুতপক্ষে ভারতচন্দ্রের পরে আর কোন কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করেননি, অথবা আর কোন কবি মঙ্গলকাব্য রচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। যেমন করে প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় তেমনি করে মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য ধারা শুকিয়ে যাওয়ার আগে ভারতচন্দ্রের প্রতিভার আলোক দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনে ভারতচন্দ্র ও তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য একটি বিশিষ্ট পর্যায়। মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় অন্নদামঙ্গলের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়; মনে হয় ভারতচন্দ্রের যুগ পরিবেশের মধ্যেই অন্নদামঙ্গলের বীজ নিহিত ছিল। দেবদেবী চরিত্রের রূপান্তর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে ভারতচন্দ্রের দেবী অন্নদার পূর্ণতালাভ ঘটেছে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের জন্মলগ্ন থেকেই মনসা, চণ্ডী, শিব, ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পদচারণে মুখরিত ছিল বাংলা সাহিত্য। ধীরে ধীরে শিক্ষিত রুচিবান কবিদের হাতে পড়ে মঙ্গলকাব্যগুলি অনেকটা পুরাণানুগ হয়ে পড়েছিল; শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীকে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলার প্রয়াস থেকেই পৌরাণিক দেবদেবীরা লৌকিক দেবদেবীর স্থান দখল করে নিতে চলেছিল। আমরা বলতে পারি এই সংযোজকের কাজটি করেছিল দেবাদিদেব মহাদেব। অন্যান্য লৌকিক দেবীরা কখনো শিবের স্ত্রী, কখনো শিবের কন্যাতে পরিণত হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে পুরাণের দেবদেবীরা লৌকিক দেবতার স্থান দখল করে নিতে থাকে। পৌরাণিক দেবদেবীকে নিয়ে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ মঙ্গলগান রচনা করলেন। এভাবে কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এসময় রচিত। ভারতচন্দ্রের দেবী অন্নদা পৌরাণিক দেবী, সে সমাজে পূর্ব প্রতিষ্ঠিতা। মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে।শিব এবং অন্নপূর্ণা সমাজে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বলেই তাদের পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগে রচিত শিবায়ন এবং অন্নদামঙ্গলে তই দেবকথা অপেক্ষা মানবকথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোক পথেই অন্নদামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে।

অন্নদামঙ্গলের কবি ও কাব্য ঃ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর একটি বিশেষ সন্ধিপর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন; তাঁর ঘটনাকীর্ণ জীবন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। ভারতচন্দ্র সম্পর্কে তথ্য খুব বেশী নেই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সর্বপ্রথম ভারতচন্দ্র সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন ১২৬২বঙ্গাব্দে ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে। এরপর তা "কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায়।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্ধমান জেলার ভুরসুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার ছিলেন। ভারতচন্দ্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁদের কৌলীক পদবী মুখোপাধ্যায়, ধনাঢ্য হবার জন্য তাঁরা 'রায়' উপাধি পেয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে কবি সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্যাবলী পাওয়া যায়—

"ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ

সদাভাবে হত কংস ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতী যুত
ফুলের মুকুটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনশী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী।" (ভারতচন্দ্র/৩৯৬)

জনশ্রুতি অনুসারে বর্ধমানরাজের সঙ্গে নরেন্দ্রনারায়ণের বিবাদের ফলে ভুরসুট পরগণা বর্ধমানরাজের অধিকৃত হয়, ফলে নরেন্দ্রনারায়ণ নিঃস্ব হয়ে যান। এই সময় ভারতচন্দ্র বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে নওয়াপাড়া নামক গ্রামে মাতুলালয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং তাজপুর গ্রামে পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। চোদ্দ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করে স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং বিবাহ করেন। কনিষ্ঠের বিবাহে অগ্রজেরা অসন্তুষ্ট হয়ে তিরস্কার করেন, এবং শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার জন্যও তাঁকে তিরস্কার করেন। ভারতচন্দ্র অভিমানবশত গৃহত্যাগ করে দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট পারশী ভাষা শিক্ষালাভ করেন, তখন থেকেই ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তির উন্মেষ। রামচন্দ্র মুন্সীর গৃহে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে ভারতচন্দ্র স্বরচিত সত্যনারায়ণের ব্রতকথা পাঠ করেন।তখন কবির বয়স মাত্র পনের বছর। এর কিছু দিন পর ভারতচন্দ্র স্বগৃহে ফিরে যান এবং ভাইদের পরামর্শক্রমে কর সংক্রান্ত কার্যভার নিয়ে বর্ধমান গমন করেন, কিন্তু সেখানে গোলযোগ হওয়ায় ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হন এবং ভাগ্যক্রমে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এই ঘটনার পর ভারতচন্দ্র একজন ভৃত্যকে নিয়ে উড়িষ্যায় গমন করেন, সেখানে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা করে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত খানাকুলে এসে উপস্থিত হন। তখন ভারতচন্দ্র শালীপতির প্রচেষ্টায় গৃহধর্ম গ্রহণ করে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন। পরবর্তীকালে ফরাসী গভর্ণমেন্টের দেওয়ান ফরাসডাঙার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সাহায্যক্রমে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভায় স্থানলাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র গুণের পূজারী ছিলেন, তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন এবং অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার নির্দেশ দেন । এখানেই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, ভবানন্দ মজুমদারের পালা বা মানসিংহ পালা এবং রসমঞ্জরী কাব্য রচনা করেন। পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব শক্তির গুণে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ রূপে গণ্য হন।পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট থেকে মূলাজোর পরগণা লাভ করেন এবং তথায় গৃহনির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের জননী বিশেষ উপলক্ষে মূলাজোড় পরগণা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট থেকে ইজারা নেন। ফলে ভারতচন্দ্র গৃহহীন হয়ে 'গুস্তে' নামক গ্রামে গিয়ে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূলাজোড় তিনি পরিত্যাগ করলেন না। এই সময় বর্ধমানরাজের কর্মচারী পত্তনীদার রামদেব নাগের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে 'নাগাষ্টকম্' কাব্য রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজ নাগাষ্টক পাঠ করে সন্তুষ্ট হয়ে মূলাজোড়ে রামদেব নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করেন এবং ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড় পুনরায় প্রদান করেন। এভাবে কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮বছর বয়সে বহুমূত্র রোগে ভারতচন্দ্র ইহলীলা ত্যাগ করেন।

মধ্যযুগের কতিপয় কবির মত ভারতচন্দ্রও একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; তাঁর গ্রন্থতালিকা নিম্নরূপ ঃ ১) সত্যনারায়ণের ব্রতকথা ২)অন্নদামঙ্গল ৩) রসমঞ্জরী, ৪)অথ নাগাষ্টকং ৫)চণ্ডী নাটক ৬)গঙ্গাষ্টক ৭) বিবিধ (খণ্ডকবিতা)- বসন্তবর্ণনা, বর্ষাবর্ণনা, কৃষ্ণের উক্তি, রাধিকার উক্তি, হাওয়া বর্ণন, বাসনা বর্ণনা, ধেড়ে ও ভেড়ে, করদ্রাফ্থ বর্ণন, বৃন্দাবলীর উক্তি, বলি রাজার উক্তি, অথ পত্রং, হিন্দীভাষায় কবিতা। এগুলির মধ্যে একটি

কবিতা হিন্দীতে রচিত, তাছাড়া অথপত্রং, নাগাষ্টকং, গঙ্গাষ্টক সংস্কৃত ভাষায় রচিত, 'চণ্ডীনাটক' বাংলা ও সংস্কৃত মিশ্র ভাষায় রচিত।

ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অবকাশ আছে, বিশেষত সত্যনারায়ণের ব্রতকথার রচনাকাল নিয়ে। কবি সত্যনারায়ণের ব্রতকথার শেষে উল্লেখ করেছেন-"ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা"। ঈশ্বর গুপ্তের গণনা অনুসারে রুদ্র- ১১, চৌ-৪, এবং গুণা-৩, হিসাবে ১১৩৪ সন স্থির হয়েছে।[১] ঈশ্বর গুপ্তের তথ্য অনুযায়ী ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের জন্ম এবং পনের বছর বয়সে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন।[২] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে এই গণনা নির্ভুল নয়। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নরূপ-"দেবানন্দপুরে আসিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষার পূর্ব্বেই অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথার রচনাকালে তাঁহার পারস্য ভাষা শিক্ষাও শেষ হইয়াছিল; সুতরাং ১১৪৩ সনে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫/৩০ ধরাই যুক্তিসঙ্গত এবং তদনুসারে ১৮ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে (১৭০৫-১০খ্রীঃ) তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ নির্ণয় করিতে হইবে।"[৩] তাহলে কবি প্রদত্ত তথ্য 'সনে রুদ্র চৌগুণা' মোটামুটি রক্ষিত হয়।অন্নদামঙ্গলে কবি কাব্যের রচনাকাল ও সমাপ্তি কাল উল্লেখ করেছেন—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"(ঐ/৩৪৯)

অঙ্কস্য বামাগতি অনুসারে ১৬৭৪ শক অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল রচনা সমাপ্ত করেন এবং এর পরে 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন।

অন্নদামঙ্গল প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে রচিত হলেও ভারতচন্দ্র প্রচলিত কাব্যাদর্শকে গ্রহণ করেননি। কাব্যকাহিনী রচনায় ভারতচন্দ্রের কোন আদর্শ ছিল না। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ভারতচন্দ্র লোকসমাজে প্রচলিত কাব্য কাহিনীকে গ্রহণ করেননি। আসলে অন্নদামঙ্গলে কোন পরিপূর্ণ কাহিনী নেই, বরঞ্চ বলা চলে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমাহার। গ্রন্থ রচনায় ভারতচন্দ্র বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্থাদির সাহায্য নিয়েছেন; সাহায্য নিয়েছেন কালিদাসের কাব্যের, তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের কোন কোন অংশের আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাছেও তিনি ঋণী। অন্নদামঙ্গলের মধ্যবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রচলিত 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামক কাব্য এবং 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের অনুসরণে রচিত, আর কাব্যর তৃতীয় খণ্ড ভারতচন্দ্র ইতিহাসের ছায়ায় রচনা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের গ্রন্থনায় মানুষের ইতিহাস প্রবেশ সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র যেভাবে কাব্যকাহিনী রূপায়িত করেছেন তার পরিচয় তুলে ধরা হল।অন্নদামঙ্গল কাব্যে তিনটি খণ্ড; প্রথম খণ্ডঃ অন্নপূর্ণামঙ্গল। দ্বিতীয় খণ্ডঃ বিদ্যাসুন্দর। এবং তৃতীয় খণ্ডঃ ভবানন্দ মজুমদারের পালা বা মানসিংহ পালা। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে আছে— দেববন্দনা, গ্রন্থসূচনা, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন, গীতারম্ভ, সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ, সতীর দক্ষালয়গমন, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযক্ষনাশ, প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন, পীঠমালা, শিববিবাহের মন্ত্রণা, নারদের গান, শিববিবাহের সম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম, রতিবিলাপ, রতির প্রতি দৈববাণী, শিববিবাহযাত্রা, শিববিবাহ, কন্দল ও শিবনিন্দা, শিবের মোহন বেশ, সিদ্ধিঘোটন, সিদ্ধিভক্ষণ, হরগৌরীর কথোপকথন, হরগৌরীর রূপ, কৈলাশবর্ণন, হরগৌরীর বিবাদসূচনা, হরগৌরীকন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ, জয়ার উপদেশ, অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ, শিবে অন্নদান, অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য, শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা, বিশ্বকর্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি, অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ, দেবগণনিমন্ত্রণ, শিবের পঞ্চতপ, ব্রহ্মাদির তপ, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, শিবের অন্নদাপূজা,

অন্নদার বরদান, ব্যাসবর্ণন, শিবপূজা নিষেধ, শিবনামাবলী, ঋষিগণের কাশীযাত্রা, হরিনামাবলী, ব্যাসের বারাণসী প্রবেশ, ব্যাসের শিবনিন্দা, ব্যাসের ভিক্ষাবারণ, কাশীতে শাপ, অন্নদার মোহিনী রূপ, শিবব্যাসে কথোপকথন, ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণোদ্যোগ, গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি, ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার,গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার, বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন, ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য, অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা, ব্যাসের প্রতি দৈববাণী,বসুন্ধরে অন্নদার শাপ ,বসুন্ধরের বিনয়, বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ে অন্নদার দয়া, হরিহোড়ে বরদান, বসুন্ধরার জন্ম, নলকূবরে শাপ, নলকূবরের প্রাণত্যাগ, ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত, অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে— রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন, বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ, সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা, সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ, গড়বর্ণন, পুরবর্ণন, সুন্দরদর্শনে নাগরীগণের খেদ, সুন্দরের মালিনীসাক্ষাৎ, সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ, মালিনীর বেসাতির হিসাব, মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন, বিদ্যার রূপবর্ণন, মাল্যরচনা, পুষ্পময় কাম ও শ্লোকরচনা, মালিনীকে তিরস্কার, মালিনীকে বিনয়, বিদ্যাসুন্দরের দর্শন, সুন্দরসমাগমের পরামর্শ, সন্ধিখনন, বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি, সুন্দরের পরিচয়, বিদ্যাসুন্দরের বিচার, বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ, বিহারারম্ভ, বিহার, সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা, বিপরীত বিহারারম্ভ, বিপরীত বিহার, সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন, বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য, দিবাবিহার ও মানভঙ্গ, সারীশুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ, বিদ্যার গর্ভ, গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার, বিদ্যার অনুনয়, রাজার বিদ্যাগর্ভশ্রবণ,কোটালে শাসন, কোটালের চোর অনুসন্ধান, কোটালগণের স্ত্রীবেশ, চোরধরা, কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ, সুড়ঙ্গদর্শন, মালিনীনিগ্রহ, বিদ্যার আক্ষেপ, নারীগণের পতিনিন্দা, রাজসভায় চোর আনয়ন, চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা, রাজার নিকট চোরের পরিচয়, রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ, শুকমুখে চোরের পরিচয়, মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি, দেবীর সুন্দরে অভয় দান, ভাটের প্রতি রাজার উক্তি, ভাটের উত্তর, সুন্দর প্রসাদন, সুন্দরের স্বদেশগমনপ্রার্থনা, বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ, বার মাস বর্ণন, বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা।

তৃতীয় খণ্ডে আছে— বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান, মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি, মানসিংহের যশোরযাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্যের যুদ্ধ, মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন, ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা, দেশ বিদেশ বর্ণন, জগন্নাথপুরীর বিবরণ, মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি, পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্তকথন, পাতশাহের দেবতা নিন্দা, পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর, দাসু বাসুর খেদ, মজুন্দারের অন্নদা স্তব,অন্নদার মজুন্দারে অভয় দান, অন্নপূর্ণাসৈন্যবর্ণন, দিল্লীতে উৎপাত, পাতশার নিকট উজিরের নিবেদন, অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ, ভবানন্দে পাতশার বিনয়, গঙ্গা বর্ণন, অযোধ্যা বর্ণন, রামায়ণ কথন, ভবানন্দের কাশী গমন, ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি, ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি, বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য, ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য, ভবানন্দের অন্তঃপুরপ্রবেশ, মাধীকৃত সাধীর নিন্দা, পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি, ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ, মজুন্দারের রাজ্য, অন্নদার এয়োজাত, রন্ধন, অন্নদাপূজা, অষ্টমঙ্গলা, রাজার অন্নদার সহিত কথা, মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তিনটি খণ্ডে রচিত কাব্যের কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। যেমন—

প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতিতে দেবদেবী বন্দনা, গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, আত্মপরিচয় তথা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব থাকা সত্বেও দেবখণ্ডের বর্ণনায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রভাব আছে। শিবের দারিদ্র্য, ভিক্ষাযাত্রা এবং হরিহোড়ের দারিদ্র্যে কালকেতু কাহিনীর প্রভাব আছে এবং ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রীর কলহ বর্ণনায় বণিক খণ্ডের খুল্লনা-লহনা দ্বন্দ্বের ছায়া আছে।

তৃতীয়তঃ অন্নদামঙ্গলে ব্যাসকাহিনী ভারতচন্দ্রের নিজের সৃষ্টি। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ও ঈশ্বরী পাটনী প্রসঙ্গ কবির নিজের সৃষ্টি।

চতুর্থতঃ অন্নপূর্ণা শেষে ভবানন্দ ভবনে অধিষ্ঠিত হয়েছে, এই ভবানন্দ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে থেকে দেবী নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তি বর্ণনা কাব্যের মূল লক্ষ।

পঞ্চমতঃ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দরে কাহিনীর সঙ্গে মানসিংহের কিংবা ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনীর কোন যোগ নেই, এমন কি ত্রয়ী কাব্য হলেও বিদ্যাসুন্দরের দেবী কালিকা অন্নপূর্ণা নয়।

ষষ্ঠতঃ মধ্যযুগে চরিতগ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনেক কবিই পৃষ্ঠপোষক রাজা বা জমিদারের নির্দেশে কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু কাব্য লিখেছেন দেবমাহাত্ম্যসূচক। ভারতচন্দ্র প্রথম চরিত গ্রন্থের বাইরে মানুষের ইতিহাস নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা করলেন। দেব ভাবনায় অভিনব পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। দেব মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে কবি পৃষ্ঠপোষকের পূর্বপুরুষের যশোকীর্তন করেছেন।

সপ্তমতঃ ভারতচন্দ্র ইতিহাস নয় কাব্য লিখেছেন। তাই ইতিহাসের মধ্যে থেকে কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। এখানেই ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা।

অষ্টমতঃ সাধারণত মঙ্গলকাব্যগুলি সমাজের সৃষ্টি, কবির মুখে সমাজ কথা বলেছে; কিন্তু ভারত চন্দ্রের কাব্য ব্যক্তি ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি। এখানে মানুষের ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ লক্ষ করার মত।

সমাজ বৃত্ত ঃ

ভারতচন্দ্র ইতিহাসের এক বিশেষ যুগপরিবেশে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন; ভারতচন্দ্রের দাবী ছিল তিনি নতুন মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। যাই হোক, যেহেতু তিনি মঙ্গলকাব্যের কবি, তাই মঙ্গলকাব্যের প্রথাসম্মত রীতিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই ভারতচন্দ্রের কাব্যেও লোকজীবনের নানা উপাদান কাব্যে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। ইতিহাসের লৌকিক উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করে পূর্বোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ প্রথমে আসা যাক্ বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথায়। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল খাদ্য ও পানীয়। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত বা অন্ন। অন্নদা অন্নেরই দেবী, সে ভক্তকে অন্ন দান করে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাঙালীর নিরামিষ ও আমিষ চর্ব্য-চোষ্য- লেহ- পেয়ের উপযোগী তিক্তকষায়- অম্ল-মধুর চার প্রকার স্বাদের খাদ্যের কথাই আছে। বাঙালীর ব্যঞ্জনক্রম অনুযায়ী প্রথমে নিরামিষ বিভিন্ন প্রকার শাক; বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মুগ, ছোলা, অড়হর, মাষ, বরবটী, মটর, ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার সব্জি, যথা— নারিকেল, থোড়, কাঁঠাল বীজ, বেগুন, কুমড়ো ইত্যাদি থেকে নানা প্রকার ব্যঞ্জন তৈরী হত। ব্যঞ্জনগুলি হল, যথা- বড়া, বড়িভাজা, নারিকেল ভাজা, দুধথোড়, ডালনা, শুক্তানি,ঘন্ট ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রের ভাষায়—

"হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি খন্ট ভাজা নানামত শাক ॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘন্ট তাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া॥

নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে ।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে।" (ঐ/৩৪১)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আবার প্রমাণিত হল 'মাছে ভাতে বাঙালী'। বিভিন্ন প্রকার মাছ ও মাছের ব্যঞ্জন বাঙালীর খাদ্য তালিকাকে সমৃদ্ধ করেছে, যেমন— মাছভাজা, মাছের ঝোল-ঝাল, মুড়োঘন্ট, চরচড়ি, মাছের ডিমের বড়া, মাছের টক ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, মাছ ও মাংসের বিভিন্ন প্রকার বিদেশী ব্যঞ্জনও এযুগে বাঙালীর খাদ্য তালিকায় স্থান লাভ করেছিল। মাছ, পাঁঠা, খাসি, কচ্ছপের মাংস সহযোগে বিভিন্ন ব্যঞ্জন তৈরী হত, যেমন— মাছ ও মাংসের কালিয়া, কোপ্তা, দোলমা, বাগা, সেকচী, সামসা,কাবাব ইত্যাদি। তারপর খাদ্য তালিকায় পড়ে টক জাতীয় ব্যঞ্জন। আম, আমসত্ব, আমসি, কুল, তেঁতুল, আমড়া, চালতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হত টক জাতীয় ব্যঞ্জন। এবং সব শেষে হত মিষ্টান্ন ও পিঠা, যেমন- পায়েস, বড়া, আস্‌কে পিঠে, পুরি, পীযূষী, পুলী, চুষী, রুটি, মুগসাউলী, কলাবড়া, ঘিয়ড়, পাঁপড় ইত্যাদি। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।
চুষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী॥
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা বাজরার চালু দিলা॥" (ঐ/ ৩৪২)

খিচুড়ি বাঙালীর একটি অতি প্রিয় খাদ্য। খাদ্য বিষয়ে বাঙালী কত সৌখিন তার প্রমাণ পাওয়া যায় অন্নদামঙ্গলে। বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম চালের অন্ন ধনী বাঙালীর খাদ্য তালিকায় পড়ে। ভারতচন্দ্র– পায়রারস, বাঁশমতি, কুসুমশালী ইত্যাদি অজস্র ধানের উল্লেখ করেছেন। যেমন—

"পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥
.....
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু॥ (ঐ)

দুধ, দই, ঘি, মধু, বিভিন্ন প্রকার মসলা— লবঙ্গ, জায়ফল ইত্যাদি বাঙালীর খাদ্য তালিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়াও ক্ষীর, চিনি, মিছরি, সন্দেশ ইত্যাদি নানা সুখাদ্যের উল্লেখ করেছেন কবি। যেমন—

"ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি॥ (ঐ/২০৯)

রন্ধন বাঙালীর একটি বিশিষ্ট শিল্প; রন্ধন, পরিবেশন ও ভোজনে বাঙালীর নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য আছে। রন্ধন একটি অতি পবিত্র কার্য হিসাবে পরিগণিত হত, তাই স্নান করে শুদ্ধ হয়ে অগ্নিপূজা করে দেবদেবীকে স্মরণ করে

তবেই রন্ধনকার্যে প্রবৃত্ত হতে হত—

"স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥" (ঐ/৩৪১)

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাঙালী সমাজে পান-সুপারির ব্যাপক প্রচলন ছিল। পান, সুপারি, চুন, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচ, জয়িত্রী, জায়ফল দিয়ে দিয়ে পান সাজানো হত। আহারের শেষে পান খাবার রীতি কিংবা সম্ভোগের বলকারক উপাদান হিসাবে পান-সুপারির ব্যবহার ছিল। যেমন—

"মিঠা পান মিঠা গুয়া চূন পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া॥
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল॥ (ঐ/২০৯)

যুদ্ধাস্ত্র ঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যেও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জামের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্য প্রসাধন বেশী থাকায় মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ বর্ণনারীতির প্রয়োগ অনেক কম, বর্ণনার অবকাশও কম। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে যুদ্ধাস্ত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্বে অনেকটা আধুনিক যুদ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। খাঁড়া, ঢাল, তরোয়াল, তীর ধনুকের ব্যবহার হলেও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কামান, গোলা, বন্দুক ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হয়ে গেছে। প্রাচীনকালে হস্তী বাহিনী, অশ্ব বাহিনী, পদাতিক বাহিনী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত এবং স্থলপথ ও জলপথে যুদ্ধ হত। প্রতাপাদিত্যের বিশাল নৌবাহিনী ছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ বর্ণনায় প্রতাপাদিত্যের বিশাল নৌবাহিনীর কথা জানা যায়। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে—

"ধূধূ ধম্ ধম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্
দমামা দম্‌দম্ বাজে।
হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড়
কামানের গোলা গাজে॥
. . . . . .
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥ (ঐ/২৯৬-২৯৭)

সাজসজ্জা ঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ খুব একটা নেই।তবে সাধারণ বাঙালী পুরুষের পোশাক ছিল জোড়, ধুতি, চাদর, ইজার ইত্যাদি। নারীর পোশাক ছিল প্রধানত শাড়ী, তবে বক্ষাবরণ কাঁচুলি পরিধান করত, তাছাড়া মেয়েদের মধ্যে ঘাঘড়া পরার প্রচলন ছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কোটালগণ চোর ধরার জন্য নারী বেশ ধারণ করেছে, সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের কথা পাই। যেমন —

"কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘুরীতে॥" (ঐ/২৪৭)

সেকালে তাঁতিরা শ্রীরাম, তসর, মেঘডম্বর, বাঘাম্বর ইত্যাদি মূল্যবান শাড়ী তৈরী করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥" (ঐ/৩৩০)

কিংবা— "খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।" (ঐ/১৩৩)

মেঘডম্বর, বাঘাম্বর শাড়ীর উল্লেখও পাওয়া যায়—

"শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর।" (ঐ/২৮৬)

পুরুষরা প্রধানত ধুতি পরিধান করত, তবে ঘরের বাইরে কাজ করার জন্য ধনীদের আলাদা পোশাক থাকত। ভারতচন্দ্র ভবানন্দ সম্পর্কে লিখেছেন—

"দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার ।
দাসু যোগাইল ধুতিজোড় পরিবার॥" (ঐ/৩২৯)

রাজকর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিরা ঘড়ি, নাগরা জুতা, শিরোপা পরিধান করত। তৎকালে ঘড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছিল বোধহয়, কেননা ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঘড়ির উল্লেখ আছে। তাছাড়া ভারতচন্দ্র লিখবেন কেন—

"রাজাই পাইলা ঘড়ি নাগারা নিশান। (ঐ/৩২৮)

অন্নদামঙ্গলে বাঙালীর সাজসজ্জা ও প্রসাধনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত তা অবশ্য সুপ্রচুর নয়। নারীরা বিভিন্ন শৌখিন পোশাক-পরিচ্ছদের পাশাপাশি আলতা, সিন্দুর, চুয়া, চন্দন, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করত। সাধারণ দরিদ্র বাঙালী নারীর প্রসাধনদ্রব্য ছিল শাঁখা, সিন্দুর, আলতা ইত্যাদি। এয়োস্ত্রীদের অন্যতম প্রসাধন ছিল সিন্দুর ও আলতা। ছদ্মবেশিনী দেবী অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় পার হতে গিয়ে পাটনীকে বলে ছিল—

"ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥" (ঐ/১৫৮)

এয়োস্ত্রীরা রাঙ্গা শাড়ী, রাঙ্গা শাঁখা ও সিন্দুর পরিধান করত। যেমন —

"রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামালা গলে।
সিন্দুর কপালভরা খাঁড়া করতলে॥" (ঐ/২৪৮)

তাছাড়া আতর, চুয়া, চন্দন, কেশর, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য, পুষ্পমালা, গঙ্গাজল প্রসাধন হিসাবে ও গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবেও ব্যবহৃত হত। যেমন—

গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পূরি॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা॥
.....
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত॥" (ঐ/২০৯)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাঙালীর নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়, যথা– কেয়ূর. কঙ্কণ, কেশর, নূপুর, ঘুঙুর, কুণ্ডল, হার ইত্যাদি। যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিদ্যাসুন্দর পালায় বিদ্যা ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি হল—

"ঝন ঝন কঙ্কণ রণ রণ নূপুর
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্ঘুর বোলে।
লটপট কুন্তল কুণ্ডল ঝলমল
পুলকিত ললিত কপোলে॥" (ঐ/২১২)

অলঙ্কারে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর ব্যবহার করা হত। যেমন—

"হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায়।

দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পালায়॥" (ঐ/২৮৬)

অলঙ্কার হিসাবে বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি ফুলের মালা ব্যবহার করত শৌখিন ধনী কন্যারা, তারা গলায়, হাতে ও খোপায় ফুলের মালা ব্যবহার করত। বিদ্যাসুন্দর পালায় বিদ্যার প্রসাধনে পুষ্প সজ্জার কথা আছে। ধনী জমিদারগণ ফুল জোগাবার জন্য মালিনী রাখত, তারা মেয়েদের জন্য মালা গেঁথে সরবরাহ করত। সেকালের শয্যা নির্মাণের কথা পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে।ধনীরা শয্যা রচনার জন্য খাট ও পালঙ্ক ব্যবহার করত এবং নানা ধরনের মূল্যবান উপকরণ দ্বারা গৃহসজ্জা করত।

সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও কাপালিকগণ ভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভিন্ন ধরনের সাজসজ্জা ব্যবহার করত। শৈবরা বাঘথাবা বা বাঘচর্ম চিহ্নিত নামাবালী, বৈষ্ণবরা হরিনাম লেখা হরিনামাবলী পরিধান করত। তাদের তৈজসপত্র বা সাজসজ্জার উপকরণ হল কমণ্ডলু, কোশাকুশি, করঙ্গ, তুম্বীফল ইত্যাদি । তারা গলায়, বক্ষে, কপালে, তিলক চিহ্ন বা চড়ক ফোঁটা অঙ্কন করত। বস্তুতপক্ষে এগুলি তাদের ধর্মাচরণের চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার করা হত। যেমন 'ব্যাসবর্ণন' অংশে ব্যাসদেবের বেশভূষার যে পরিচয় পাই তা নিম্নরূপ —

"কপালে চড়ক ফোঁটা গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলিমৃগ বাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠি গলে লম্বি মালা করতলে
হাতে কানে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসার মৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কৌপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পিবারে জল
হাতে আশা হিঙ্গুলবরণ।" (ঐ/৯০)

বাদ্যযন্ত্র ঃ ভারতচন্দ্রের সমকালে লোকসমাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাই অন্নদামঙ্গলে, যেমন— বীণা, বাঁশি, রবাব, কপিনাশ, তম্বুরা, শঙ্খ, ঘন্টা, সপ্তস্বরা, ঘুঙুর, মোচঙ্গ, নহবৎ, দামামা, রণশিঙ্গা, রণভেরী, ভোড়ঙ্গ, ধামসা, ঝাঁঝড় ইত্যাদি। বাদ্যযন্ত্রগুলি উৎসব অনুষ্ঠান, বিজয় উৎসব, নৃত্য-সঙ্গীত পরিবেশনে বাজানো হত। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে পাওয়া যায়—

"বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ॥
আঙ্গুলে ঘুঙ্গুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
.....
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।

বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥" (ঐ/২১০)

আবার কিছু কিছু রণবাদ্যেরও উল্লেখ আছে এখানে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানসিংহ পালায় 'মজুন্দারের রাজ্য' অংশে ভবানন্দ মজুমদার রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হলে ভারতচন্দ্রের বর্ণনায়—

"ধূধূ ধূধূ নৌবত বাজে রে।
বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার
রাজা হৈলা বাগুয়ান মাঝে রে॥
ভোঁভোঁ ভোরঙ্গ বাজে ধাঁধাঁ ধামসা গাজে।
ঝাঁঝাঁঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁজে রে।
ঘড়ি বাজে ঠন ঠন ঘন্টা বাজে রন রন
গন গন গজঘন্টা গাজে রে॥" (ঐ/৩৩৭)

পূজা-পার্বণ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে শঙ্খ, ঘন্টা বাজানো হত। ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে প্রত্যাগমন উপলক্ষে তাকে শঙ্খ, ঘন্টা, উলুধ্বনি সহযোগে বরণ করে নেওয়া হয়—

"শঙ্খ ঘন্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥" (ঐ/৩২৯)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাতায়াতের অর্থাৎ পরিবহনের মাধ্যম ছিল মূলত পশুপৃষ্ঠে আরোহণ। নিকটবর্তী স্থানে যাতায়াতে মহিলারা পালকী ও দোলা ব্যবহার করত, আর যুদ্ধযাত্রা বা দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল হাতি, ঘোড়া, উট ইত্যাদি দ্রুতগামী পশু।

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসা যাক্ অন্নদামঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ বা অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক উপাদানের কথায়। ভারতচন্দ্রের কাব্য মঙ্গলকাব্য হলেও সমাজের সৃষ্টি নয়, ব্যক্তি ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি, একারণে সমাজের খুঁটিনাটি বিবরণ এতে স্থানলাভ করেনি। ভারতচন্দ্রের জীবনীতে লক্ষ করা যায় সংস্কার- বিশ্বাস বা আচার-আনুষ্ঠানিকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। অনেকক্ষেত্রেই কবি আচার আনুষ্ঠানিকতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করেছেন, হাসির উপকরণ করে তুলেছেন; এটা অবশ্য ভারতচন্দ্রের যুগ প্রবণতারই উপস্থাপনা। ভারতচন্দ্রের সমকালে পুরাতন কাব্যধারা স্তব্ধ হয়ে নতুন কাব্যধারা ও নতুন ভাবধারা সৃষ্টি হতে চলেছিল। ভারতচন্দ্র তাকে কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন, তাই পুরাতন কাব্যের বর্ণনা প্রাধান্যকে খানিকটা হলেও পরিহার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাব্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান,সংস্কার-বিশ্বাস বর্ণনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্র সে সুযোগ গ্রহণ করেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে তেলপড়া, জলপড়া, ধুলাপড়ার মত ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করা হত। আবার এসব নিবারণের জন্য তাবিজ বা মাদুলি ধারণ করা হত। 'মানসিংহ পালা'য় দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব ঘটলে ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা।
লিখে দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥
এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥ (ঐ/৩১৫)

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেখানে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার-বিশ্বাস স্থানলাভ করেছে, সেখানে ভারতচন্দ্র কাব্যে এসবকে স্থান দেননি। আচার-কেন্দ্রিক উপাদানের ব্যবহার ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে তবে তার পুঙ্খানুপঙ্খ বর্ণনা নেই। আসলে এসময়ে বাঙালী সমাজে সন্তানের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সম্পর্কিত আচারগুলি পালিত হত; কিন্তু ভারতচন্দ্র

তাঁর কাব্যে তাকে বর্ণনার বিষয় না করে স্পর্শ করে গেছেন মাত্র। নবজাতকের জন্মের পর ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা, ছয় মাসে অন্নস্পর্শ বা অন্নপ্রাশন করা হত । হরিহোড়ের জন্মের পরও এই আচার পালিত হয়েছে। যেমন —

"ষষ্ঠীপূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা, হৈল নানা দুঃখ পায়ে।" (ঐ/১৪১)

কিংবা, সুন্দরের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণের পর—

"পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হইল তনয়।" (ঐ/২৮৪)

বিবাহকালেও কিছু কিছু আচার পালিত হত। কন্যাগৃহে বরযাত্রীদের আগমন হলে তাদের বরণ করে নেওয়ার পর বিবাহ সভায় অধিষ্ঠান করা হত। কনের পিতা নানা উপহার সামগ্রী দান-সজ্জা বরকে উপহার দিত। বিবাহকালে শাস্ত্রীয় মতে পুরোহিত বরের পিতৃপিতামহের পরিচয় জানতে চাইত, হিন্দু বিবাহরীতিতে এটা আবশ্যিক ভাবে পালিত হত। শিববিবাহে এই আচার পালিত হতে দেখা যায়—

"কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত।
হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥" (ঐ/৪১)

যথাশাস্ত্র কন্যাদানের পর পালিত হত নানা রকম স্ত্রী আচার। যেমন—

"এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী আচার কবিবারে মেনকা আইলা॥
.....
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনিডালা হুলাহুলি দিয়া॥" (ঐ)

বিবাহে বরপণ ও কনেপণ উভয়ই প্রচলিত ছিল। অন্নদামঙ্গলে দাসু-বাসুর উক্তিতে ষোল টাকা পণ দিয়ে বিবাহ করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে।

মৃত্যু সম্পর্কিত আচারের উল্লেখ নেই ভারতচন্দ্রের কাব্যে। তবে মৃত্যু সম্পর্কিত বিশ্বাস ও আচারের কথা আছে। তীর্থস্থান হিসাবে কাশী বাঙালীর নিকট অতি পবিত্র, এখানে মৃত্যুবরণ করলে মোক্ষলাভ হয় এজাতীয় বিশ্বাসে বাঙালী প্রতিপালিত। তাইতো ব্যাসদেব শিব-কাশী অপেক্ষা দ্রুত ফল লাভের জন্য ব্যাস-কাশী স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। বাঙালীর এজাতীয় বিশ্বাসে ভারতচন্দ্রের আস্থা না থাকলেও এই বিশ্বাসকে রূপায়িত করেছেন। জরতী বেশধারী দেবী ব্যাসের কাছে এ কথাই জানতে চেয়েছে—

"তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥
.....
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥" (ঐ/১২৯)

মৃত্যুর পর গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন বা কাশীতে পিণ্ডদান বাঙালীর মৃত্যু বিষয়ক আচারের অন্তর্গত। তাছাড়াও বিভিন্ন

পূজা-পার্বণে, বার-ব্রতে নানা ধরনের আচার পালিত হত। ব্রতমাহাত্ম্য ও ব্রতকথা শ্রবণে বিশ্বাস ছিল, তাইতো দেবী অন্নপূর্না ভবানন্দ মজুমদারকে দেবী প্রদত্ত ঝাঁপি না খোলার পরামর্শ দেয়, দেবীর এই নির্দেশ পালন করলে গৃহে দেবী অচলা হয়ে থাকবে। তাই কবি লেখেন—

এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে॥ (ঐ/১৫৯)

চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণা পূজা অনুষ্ঠিত হত। পূজা উপলক্ষে ব্রতী ও এয়োস্ত্রীদের তেল-সিন্দুর দেওয়া হত। শুধু তাই নয়, কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বা ঘরের পুত্র ঘরে ফিরে এলে নানা উপচারে বরণ করে নেওয়ার প্রথা ছিল । ভবানন্দ দিল্লী থেকে দেশে ফিরে এলে নানা বাদ্য বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। এ উপলক্ষে এয়োস্ত্রীদের মধ্যে তেল, সিন্দুর বিতরণ করা হত। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে—

"সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে ।
পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে॥
.....
পাইয়া সিন্দুর তৈল গেল রামাগণ।
ভাবিছে মজুন্দার কি করি এখন॥" (ঐ/৩২৯)

চৈতন্য-পূর্ব যুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে নিত্যকর্ম বা সায়ংসন্ধ্যার কথা পাওয়া যায় না। চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব সমাজে নিত্যকর্ম বা সায়ংসন্ধ্যা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই বৈষ্ণবীয় প্রভাবের কথা আছে। ভবানন্দ মজুন্দার যথারীতি সায়ংসন্ধ্যা প্রতিপালন করত। কবি লিখেছেন—

"সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান॥" (ঐ)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দৈবজ্ঞ, গণৎকার, ওঝাদের কোন প্রভাবের কথা নেই। আসলে তাঁর কাছে এসব উপেক্ষনীয় বিষয় ছিল, কিন্তু সমাজের অন্তঃস্থলে এসবের ক্ষীণধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল।

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসি ভাববাদী উপকরণগুলির কথায়। ভারতচন্দ্রের জীবনী পাঠে সেকালের শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণা করা যেতে পারে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কাব্যশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি প্রথাগত শিক্ষা প্রচলিত ছিল। 'সুন্দরের বিচার' অংশে কাব্য, অলংকার, সাহিত্য, নাটক ছাড়াও বেদান্ত, মীমাংসা, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, সাংখ্য, বাদরায়ণ, পুরাণ, সংহিতা, মনু ইত্যাদি দর্শন চর্চার কথা আছে। ভারতচন্দ্রও তার পাঠগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল। ভারতচন্দ্র প্রথাগত শিক্ষার জন্য তিরস্কৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও স্বয়ং আরবী, ফারসী ভাষা শিক্ষালাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। বস্তুতপক্ষে সময়োপযোগী বস্তুমুখী শিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও তার প্রয়োজনের দিকটি এযুগে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরও প্রথাগত শিক্ষার বাইরে নানা শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। ভারতচন্দ্রের সময়কালে চাকুরীবৃত্তি বা রাজসেবা স্বীকৃতি পেয়েছে, ফলে বৃত্তির প্রয়োজনেই এজাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। নারীশিক্ষার প্রচলন খুব একটা না থাকলেও অভিজাত ঘরের নারীরা শিক্ষালাভ করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে বিদ্যা শিক্ষিতা রমণী ছিল এবং বিদ্যা গৌরবে সে বড়বড় পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছে বলে জানা যায়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় সামান্য আছে। আচার-আচরণ, বার-ব্রত, পালা-পার্বণে বাঙালীর নিজস্ব ধ্যান, মনন, সৌন্দর্যবোধ প্রকাশিত। শিল্পকর্ম, সজ্জারীতি, প্রসাধনচর্চা বাঙালীর শিল্পবোধের পরিচায়ক। বার-ব্রতের পাশাপাশি বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, বিশেষত দুর্গাপূজার কথা আছে।

দুর্গাপূজা বাঙালী সমাজে বিশিষ্ট প্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছিল। বিদ্যা সুন্দরের নিকটে 'বার মাস বর্ণন' অংশে দুর্গাপূজার কথা বলেছে—

"আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমাপ্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥" (ঐ/২৮৮)

বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের অনেকগুলির পরিচয় আছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে, যথা— কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে রাসযাত্রা, পৌষে নবান্ন ও পৌষপার্বণ, চৈত্রে দোল ইত্যাদি। ভারতচন্দ্র বিদ্যার 'বার মাস বর্ণন' অংশে লিখেছেন—

কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্তমহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার।
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥" (ঐ)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে নতুন নতুন সংস্কৃতিচর্চার ধারা গড়ে উঠেছিল। পুরাতন সাহিত্য শাখাগুলি ম্রিয়মান হলে শাক্ত সাহিত্য, ঝুমুর, খেউর, আখড়াই, কবিগানের মত বিষয়গুলি সাংস্কৃতিক জগতে বিস্তৃত হতে থাকে। নদীয়া, শান্তিপুর অঞ্চলের ঝুমুর ও খেউর গান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে বিদ্যা সুন্দরকে নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চল থেকে নতুন খেউর বা 'খেঁড়ু' এনে শোনাতে চেয়েছে—

"নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥ (ঐ)

বাঙালীর গৃহসজ্জা, মণ্ডপসজ্জা, বিবাহরীতি, পূজা-পার্বণে বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিল্পবোধের ছাপ আছে।

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথা বলা যাক্। প্রচুর প্রবাদ- প্রবচনের ব্যবহার আছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে, যার সঙ্গে সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের সম্পর্ক থাকতে পারে। ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত প্রবাদগুলির উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা—

১। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
২। মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে।
৩। খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।
৪। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন।
৫। হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
৬। স্ত্রী ভাগ্যে ধন আর পুরুষের ভাগ্যে পুত্র।
৭। বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানি ।
৮। নারী যার স্বতন্তরা সে জন জিয়ন্তে মরা।
৯। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে।
১০। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।
১১। নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

১২। যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে।

১৩। গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল।

১৪। বড়র পিরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥

১৫। যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।

১৬। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ।

১৭। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।

১৮। সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥'

১৯। ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।

২০। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর॥

২১। যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।

২২। মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়।

২৩। মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥

২৪। বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি সুদ্ধি যায়।

২৫। সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায়।

২৬। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট।

২৭। ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।

সামাজিক অবস্থা ঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে বর্ণিত অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বলতে হলে আমাদের অবশ্য মনে রাখা উচিত ভারতচন্দ্র অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিগণের মত জনসভার কবি নন, তিনি রাজসভার কবি, নাগর জীবনের কবি। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে নাগরিক জীবনের বৈদগ্ধ ও রুচি। এমন কি ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রটির কথাবার্তায় নাগরিক রুচির প্রকাশ আছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অনেকেই রাজসভাকে আশ্রয় করে কাব্য রচনা করলেও কবি নিজ পরিবেশকে ভোলেননি; তাই তাঁদের লেখনীতে এসেছে সমাজ ইতিহাসের নানান উপাদান। আর ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা পেয়েছি নাগর জীবনকথা ও নাগর রুচিবোধকে। ভারতচন্দ্রের চেতনা ও রুচিবোধ ছিল ভিন্নতর। লক্ষণীয় কালগত তফাৎ ব্যতিরেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগর জনসমাজ জনরুচি, জনচরিত্র তাদের আচার-বিচার, সংস্কারের ভারে কখনো কখনো ভারগ্রস্থ হয়ে পড়লেও নাগর জীবন বাংলার ঐতিহ্য এবং জীবনধারাকে বহন করে চলেছিল। তাই বাঙালীর পারিবারিক জীবন. নারীর অবস্থান ইত্যাদিতে প্রায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি, অনেকক্ষেত্রেই পুরাতন রীতি-রেওয়াজ জগদ্দল পাথরের মত শ্বাসরোধ করেছে। ফলে জনজীবনে কালগত প্রয়োজনবোধেই এসেছে প্রচলিত রীতিনীতি. সংস্কারের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীর অবস্থানগত সত্যতা ফুটে উঠেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। এযুগেও নারী ছিল প্রকৃতপক্ষে পরান্নজীবী। বস্তুতপক্ষে নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তাই সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে নারী অক্টোপাসের বন্ধনকে মেনে নিলেও সমাজকে উপেক্ষা করতে চেয়েছে। ফলে ধনীঘরের নারীও খানিকটা বিলাসিতা ও অবজ্ঞার চোখে দেখেছে সমাজকে। নারীর প্রচলিত মূল্যবোধের অবসান ঘটেছে. তাই মুকুন্দের কাব্যের "স্বামী বনিতার পতি/স্বামী বনিতার গতি/স্বামী বনিতার সে বিধাতা।" (মুকুন্দ/৫৩)। ঐ জাতীয় বিশ্বাসের

মূল্য অষ্টাদশ শতকে ছিল না— ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় আছে। ভারতচন্দ্র 'হরগৌরীর কথোপকথন' অংশে হরগৌরীর বাক্যালাপে তা ব্যক্ত করেছেন। গৌরীর দৃষ্টিতে পুরুষের প্রেম ছিল অসম্পূর্ণ—

"হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারীর সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥" (ঐ/৫১)

পুরুষশাসিত সমাজ নানান সংস্কার, আচার-বিচারের ভারে নারীকে ভারগ্রস্ত করছে আর এই সঙ্গে তৈরী হয়েছে সমাজের কঠোর নিয়মতন্ত্রতাকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা। তাইতো শিবঠাকুর তার সংসারের আর্থিক অবনতির জন্য গৌরীকে দায়ি করলে গৌরী শিবঠাকুরের এই অভিযোগ স্বীকার করেনি। এমন কি 'স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র' এই প্রবাদবাক্যটিও গৌরী স্বীকার করেনি। এতদিনের সমাজচিত্রের বিপরীত চিত্র এখানে দেখা যায়। তাই গৌরী স্পষ্ট জবাব দিয়েছে—

"আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সব হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥" (ঐ/৫৮)

তাইতো শিবের খেদোক্তি, সে স্বামী হিসেবে যথার্থ সম্মান পায় না—

"আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥" (ঐ/৫৭)

তাসত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ বাঙালী নারীর অবস্থা ছিল ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর চাইতে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। পুরুষ-কেন্দ্রিক পারিবারিক জীবনে নারীর স্বাধীনতা তো দূরের কথা স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকারও ছিল না। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার কখনোই স্বীকৃত হয়নি, নারী সাধারণত অশিক্ষিত , এমন কি তাদের উপযুক্ত জীবিকা অবলম্বন বা শিক্ষার উপযুক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ছিল না। সর্বময় কর্তা পুরুষ স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করত। বিশেষত কুলীন ঘরের নারীর অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন ছিল। নারীকে পরিবারের শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হত, অন্যথায় নেমে আসত কঠোর শাস্তি। যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে নারী কোনক্রমেও পরের বাড়ি এক রাত্রির জন্য অবস্থান করতে পারত না, তাহলে সমাজ তাকে গ্রহণ করত না। আবার বিবাহিতা নারীর কাছে পিত্রালয়ও নিরাপদ ছিল না, পিতৃগৃহে সমবেদনার পরিবর্তে গঞ্জনা মিলত। তাইতো ভিখারী শিবের সংসার ত্যাগ করে পিতৃগৃহে যেতে চাইলে সখী জয়া অন্নপূর্ণাকে উপদেশ দিয়েছে-

"জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥" (ঐ/৬১)

নারীর অবস্থানগত নিম্নতা সত্ত্বেও কিন্তু নারীই কখনো মাতৃরূপে, কখনো বা বধূরূপে পরিবারের কেন্দ্রস্থলে ছিল।

বাঙালীর পরিবারের নারীর এই কেন্দ্র স্বরূপ হয়ে উঠার জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হত। অন্নপূর্ণা হরিহোড়কে উপদেশ দিতে গিয়ে তাই বলে—

"গৃহিণীর পাপ পূণ্যে ঘর থাকে মজে॥" (ঐ/১৪৪)

সন্তান প্রতিপালন থেকে সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গল কামনায় নারীর দায়িত্ব সমধিক ছিল। তাইতো সতী পিতৃগৃহে গেলে কৃষ্ণবর্ণা সতীকে দেখে পিতা তিরস্কার করলেও মাতৃহৃদয় কেঁদে ওঠে। সতীর জননী কন্যাকে সর্বাগ্রে পেটভরে আহার করায় —

"জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বরা হইয়া॥" (ঐ/১৯)

সন্তানের যাবতীয় আনন্দ-আবদার ছিল মাকে কেন্দ্র করে। দরিদ্রের সংসারে অভুক্ত সন্তানের দায় মাকে সামাল দিতে হত। তাইতো ঈশ্বরী পাটনী সন্তানের জন্য দেবতার কাছে মোটা ভাত-কাপড় চায়। সমাজে নারীর পর্দাপ্রথা যে কঠোরভাবে পালিত হত তা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। কুলীন সমাজে নারী ছিল পর্দানসীন, তারা ঘরের বাইরে যেতে পারত না। তাইতো ছদ্মবেশিনী দেবীকে কুলবধূ হিসাবে একা দেখতে পেয়ে ঈশ্বরী পাটনী বিস্মিত হয়েছে। তাই ঈশ্বরী পাটনী একা কুলবধূকে নৌকায় পার করতে ভয় পায়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদ্যাকে এভাবেই পর্দানসীন করে রাখা হয়েছিল। অন্তঃপুরের নিরাপত্তার জন্য পরিচারিকা এবং খোজা সৈন্যদের রাখা হত। সাধারণ ঘরের নারীরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ছিল, তাদের কোন রকম কঠোরতা ছিল না। এ'কারণে সাধারণ নিম্নবর্ণের নারীরা জীবন-জীবিকারক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে পারত, সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়াও আর্থিক উপার্জনে অংশ গ্রহণ করত। উচ্চবর্ণের অর্থাৎ কুলীন ঘরের মেয়েরাও অনেকক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনে অংশ গ্রহণ করত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বা নিম্নশ্রেণী মেয়েরা ধান ভানতো, কিংবা সুতা কেটে অর্থ উপার্জন করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা অংশে এক নারীর উক্তিতে চরকায় সুতা কেটে উপার্জনের কথা পাই। হরিহোড়ের জননী ঘুঁটে বেচে অর্থ উপার্জন করে। ব্রাহ্মণ সমাজে বিধবাদের অবশ্য পর্দাপ্রথার বালাই ছিল না। বিধবা ব্রাহ্মণীরাও অনেক সময় ধনীগৃহে ধাত্রীবৃত্তি, পরিচারিকাবৃত্তি গ্রহণ করত। মুকুন্দের কাব্যে দুর্বলা, ভারতচন্দ্রের কাব্যে হীরা মালিনী, কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিমলা মালিনীর কথা আছে। এরা ফুল বিক্রি করত আবার দাসীবৃত্তিও করত।

নারীর সতীত্বে বিশ্বাস ছিল প্রবল। অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত নারীকে সমাজ গ্রহণ করত না। সামাজিক বিধিবিধানের প্রতি সেকালের নারী সচেতন ছিল। তাইতো বিদ্যার অবৈধ গর্ভ শ্রবণের পর বিদ্যার জননী বিদ্যাকে তিরস্কার করে বলে—

"না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে॥ (ঐ/২৩৭)

রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে সখীরা পর্যন্ত বিদ্যাকে গঞ্জনা দিয়েছে। সখীরা বিদ্যার জননীকে "উদরে ধরেছ কেন কুল খাকী ঝি।"[৪] বলে গঞ্জনা দিয়েছিল। অসতী নারীকে আত্মীয়-পরিজনরা কেউই গ্রহণ করত না। সতীত্ব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তা মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। তাই বিদ্যার সতীত্ব পরীক্ষার চাইতে সুন্দরের সঙ্গে বিবাহ প্রদানই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগে সতীত্বের প্রতি অনুগত থেকেও নারী নিজ নিজ পতিনিন্দা করেছে এবং শেষে একটি মূল্যবোধে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অদৃষ্ট নির্ভর বাঙালী নারী অদৃষ্টের শাসনকেই মেনে নিয়েছিল।ভারতচন্দ্রের নারী কিন্তু ভাগ্যের দোহাই দেয়নি, মনের দুঃখ চেপে

রেখে কথা বলেনি এবং শেষ পর্যন্ত প্রচলিত মূল্যবোধেও আস্থা স্থাপন করেনি। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে নারীর সতীত্ব টিকিয়ে রাখাও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলার বেশীরভাগ মানুষ নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ভোগবিলাসীতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার সুন্দর চিত্র আছে। নারীও এই স্রোতে ভেসে গিয়েছিল, তাইতো রাজনন্দিনী বিদ্যার সুন্দরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় নারীগণের পতিনিন্দায় সেকালের সমাজব্যবস্থার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৌলীন্য প্রথা তো প্রচলিত ছিলই এমন কি এর কঠোরতা ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্ণহিন্দু পরিবারের কৌলীন্য প্রথা নারীকুলের চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কেননা কালক্রমে কৌলীন্য প্রথা তার মর্যাদা ও গুণাবলী হারিয়ে শুধুমাত্র বিবাহ গুণে পর্যবসিত হয়েছিল। পুরুষ সমাজের চরিত্রেও দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল, ফলে পুরুষের কৌলীন্য নির্ভর করত বিবাহ সংখ্যার উপরে। এযুগে ব্রাহ্মণ ছাড়াও রাজা মহারাজা, অর্থবান জমিদার, এমন কি কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ সমাজেও কৌলীন্য প্রথা প্রবেশ করেছিল। এরই ফলে কুলীন বরে কন্যা সম্প্রদান করে কৌলীন্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কুলীন কন্যার বিবাহ এক ভয়াবহ সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সপত্নী সমস্যার মত বহুবিধ সমস্যায় সমাজ জীবন জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। কুলীন কুলের কুল রক্ষার এই ন্যাক্কারজনক পরিণতি সম্পর্কে ঈশ্বরী পাটনীর সচেতন মন্তব্য আমাদের বিস্মিত করে—

"পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥" (ঐ/১৫৭)

কুলীন বরে কন্যা সম্প্রদানে উন্মত্ত কুলীন চূড়ামণির কন্যার বিবাহ হতে হতে যৌবন বয়ে যেত। বিদ্যাকে হীরা মালিনী তাই বলেছে—

"এ রূপ তোমার যৌবনের ভার
অদ্যাপি না হইল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া॥"(ঐ/১৮৯)

'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে কুলীন কন্যার আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে—

"আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥"(ঐ/২৬৪)

ফলে শেষ পর্যন্ত কুলীন পিতা কুল রক্ষার তাগিদে অন্ধ, কানা, খোঁড়া, আশীতিপর বৃদ্ধ কিংবা বালকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিত। ভারতচন্দ্র এক কুলীন কন্যার মুখে শুনিয়েছেন—

"যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥"(ঐ)

কৌলীন্য প্রথার এই ছিদ্র পথে কুলীন চূড়ামণিগণ কুলীনের কুল রক্ষাকে অর্থ উপার্জনের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিল। বিবাহের পর কুলীন জামাই কালেভদ্রে শ্বশুরবাড়ি আসত এবং কন্যাটি পিতৃগৃহেই থাকত। অর্থের প্রয়োজন হলে তবেই তার শ্বশুরবাড়ি আগমন ঘটত। কুলীন জামাতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য টাকা দিতে হত, শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য কন্যাকে 'শয্যাগ্রহণী' দিতে হত। কন্যার কষ্টোপার্জিত অর্থ হস্তগত করে তবেই তার প্রতিগমন হত। ভারতচন্দ্র কুলীন কন্যার এমনি করুণতম দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন—

"দু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার॥

সূতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥" (ঐ)

ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনা গতানুগতিক বর্ণনা মাত্র নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ ইতিহাসের জীবন্ত দলিল বলে মনে করা যায়। এযুগে নারীর দুর্গতির আরও একটি অন্যতম কারণ হল অসম বিবাহ। অসম বিবাহ অষ্টাদশ শতাব্দীর নারী জীবনকে অনেকাংশে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। কৌলীন্যশাসিত সমাজে তাই দেখা যেত বিদুষীর কালা স্বামী, অন্ধের সুন্দরী গৌরবর্ণা স্ত্রী, যুবতীর বৃদ্ধ স্বামী। নারীদের খেদোক্তিতে সমাজ ইতিহাসের এই মর্মবেদনা প্রকাশিত। যেমন— বিদুষী পত্নী তার কালা স্বামী সম্পর্কে বলেছে—

"এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত॥"(ঐ/২৫৯)

কিংবা, যুবতীর বৃদ্ধ স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর খেদ প্রকাশিত —

"আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥"(ঐ)

এইভাবে কৌলীন্য প্রথার যাবতীয় কুফল কিন্তু কুলীন কন্যাকেই সহ্য করতে হত। স্পষ্টভাষী ভারতচন্দ্র সমাজ জীবনের বাস্তব সত্যগুলিকেই রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

কৌলীন্য প্রথার আরও একটি কুফল হল পুরুষের বহুবিবাহ। কুলীন পুরুষ অপর কুলীনের কুল রক্ষার জন্য বহুবিবাহ করত, ফলে সপত্নী সমস্যা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে উঠেছিল। বস্তুত সপত্নীর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে কুলবধূগণ গৃহত্যাগ করত।সমাজে এসমস্ত সমস্যার কথা কারও অজানা ছিল না। তাই ঈশ্বরী পাটনী ছদ্মবেশিনী দেবী অন্নপূর্ণাকে দেখে সন্দেহবশত তার পরিচয় জানতে চায়। দেবী আলঙ্কারিক ভাষায় যে পরিচয় দিয়েছে তাতে তৎকালীন সমাজ-সত্য উন্মোচিত হয়েছে। পিতার ঘরে আদরে পালিতা কন্যার বিবাহ হয়েছে বহুপত্নীক বৃদ্ধের সঙ্গে, ফলে পারিবারিক জীবনে চরম অশান্তির মর্মান্তিক চিত্রফুটে উঠেছে—

"পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
.....
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥"(ঐ/১৫৭)

অন্নদামঙ্গলে হরিহোড়ের চার স্ত্রী এবং ভবানন্দ মজুমদারের দুই দাসী সাধী ও মাধীর দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-বিবাদ কুলীন সমাজের বাস্তব চিত্র। কুলীন নারীরা তাই কৌলীন্য প্রথা ও তাদের পিতৃপিতামহের দোষারোপ করত, গালিগালাজ করত। সপত্নী সমস্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কত নারী নিজের অথবা স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করত। যেমন বসুন্ধরার উক্তিটি স্মরণযোগ্য—

"আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥ (ঐ/১৪৮)

সে কালে ঘরজামাই রাখার প্রথাও ছিল, সেই সঙ্গে কন্যার পিতারাও অনেক সময় জামাই গৃহে বাস করত ফলে, অধিকাংশ কুলীন ঘরে নানা অশান্তি বিরাজ করত। অন্নদামঙ্গলে হরিহোড়ের পরিবারে তার শ্বশুরকে বসবাস করতে দেখা যায়। বস্তুত সমাজজীবনে এসকল সমস্যার সমাধানের কোন রাস্তাই ছিল না। কোন কোন মুসলিম শাসক চেষ্টা করেও সমাজ মানসের পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি।

কৌলীন্য প্রথার আর একটি ফলশ্রুতি হল সতীদাহ প্রথা। সতীদাহ প্রাচীন প্রথা হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। শুধুমাত্র কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজেই নয় কায়স্থ সমাজেও সতীদাহ আবশ্যিকভাবে পালিত হত। অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেখি হরিহোড়ের মৃত্যুতে সোহাগী, বসুন্ধরের মৃত্যুতে বসুন্ধরা সহমরণে গমন করে-

"সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে॥" (ঐ/১৫৬)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অন্যান্য সাহিত্যে সতীদাহের কথা পাওয়া যায়।

ক্রমাগত নিষ্পেষিত হতে হতে বাংলার নারী সমাজের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। নারী পরিবারের কেন্দ্র স্বরূপা হয়ে পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা করত তা সত্ত্বেও নারীকে নানা রকম বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ করে রাখা হত, যেমন— গুরুজনদের নাম উচ্চারণ না করা, পুরুষের সামনে বের না হওয়া, মাথায় ঘোমটা দেওয়া ইত্যাদি। এসমস্ত বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি সেকালের নারীও দায়ী ছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষাহীনতা, কুরুচিকর দলাদলি, কলহ, আত্মবিশ্বাসহীনতা নারীকে অন্ধকারের পঙ্কে নিমজ্জিত করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারী জাগরণ সম্ভব ছিল না; কিন্তু লক্ষণীয়, মধ্যযুগের শেষপর্বে নারী সমাজের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছিল । রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে গৌরীর বৃদ্ধ বরকে মনঃপুত না হওয়ায় মেনকা বরকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নারীর এই মানসিকতা লক্ষ করি। হরগৌরীর বিবাহ অংশে আমরা দেখি বৃদ্ধ বরের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য মেনকা ও অন্যান্য নারীগণ নারদ ও হেমন্ত ঋষিকে তিরস্কার করেছে —

"ও রে বুড়ো আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ॥" (ঐ/৪২)

কিংবা, গৌরীকে শিবঠাকুর অলক্ষণা বললে গৌরী নির্বিবাদে তা মেনে নেয়নি। কলহের ভঙ্গীতে হলেও গৌরীর বক্তব্যে প্রতিবাদের সুর আছে। সতীর দক্ষালয়ে যাত্রাকালে শিবঠাকুর নিষেধ করলে সতী বিভৎস্য 'দশমহাবিদ্যা' রূপ দেখিয়ে পিতৃগৃহে গমনের সম্মতি আদায় করে। ভারতচন্দ্রের 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশটিতে নারীরা যেন সমাজ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে এবং নিজ মনের কামনা -বাসনা অকপটে প্রকাশ করেছে ।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজ ও পরিবারের নানা তথ্য পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর পারিবারিক জীবনে ভাঙন ধরে ছিল তার পূর্বসূত্র পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে। ভারতচন্দ্রের নিজের জীবনেও পতনোন্মুখ পারিবারিক জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিবঠাকুরের দরিদ্রের সংসার; সে ভিক্ষোপজীবী মাত্র, কিন্তু সংসারে প্রতিপালককম নয়। তার সংসারের সদস্য স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা, তাছাড়া নিজে, নিজের বলদ, গণেশের ইঁদুর আর কার্তিকের ময়ূর। একমাত্র উপার্জনশীল শিবঠাকুর, তাও ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল; সুতরাং শিবের সংসারে নিত্য দারিদ্র্য। শিবঠাকুর জানে পূর্বেকার মত ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি নাই, তাই ভিক্ষাও তেমন পাওয়া যায় না। সংসারে পুত্রদের একজন শুধু খায় আর নেশা করে, আর অন্যজন বাবুগিরি করে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।

সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥

....

ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।

উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥" (ঐ/৫৮-৫৯)

বলাই বাহুল্য ঘরে অভাব থাকা সত্ত্বেও বাবুগিরি করার প্রবণতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাবু সমাজে বিশেষ করে লক্ষ করা গিয়েছিল— এই বিবরণে আমরা বাবু সমাজের পূর্বাভাস পাই। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক কলহ এবং অনিবার্যভাবে পারিবারিক ভাঙন্ দেখা দিয়েছিল। শিবঠাকুর গৃহত্যাগ করলে গৌরী সন্তানের হাত ধরে বাঙালী নারীর স্বভাব সুলভতায় পিতৃগৃহে যেতে চাইল, কিন্তু পিতৃগৃহে স্বামী পরিত্যক্তা রমণীর সম্মান নাই, তাই সখী জয়ার উপদেশে সংসারের হাল ধরতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়। ছদ্মবেশিনী দেবী অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগ, হরিহোড় জননীর ঘুঁটে কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ তার প্রমাণ দেয়। সপত্নী সমস্যায় জর্জর হয়ে পারিবারিক আদর্শ নষ্ট হয়েছিল। এযুগে কিছুটা হলেও আত্মসচেতন নারী তাই আপনজন অন্বেষণ করে।ভারতচন্দ্রের ছদ্মবেশিনী অন্নপূর্ণার সুস্পষ্ট উক্তি—

"যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥" (ঐ/১৫৭)

শিবায়নে শিবঠাকুরকে গৌরী সংসার প্রতিপালনের জন্য চাষবাস করার পরামর্শ দেয় নতুবা পরিজনাদি পরিত্যাগ করার কথা বলে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের গৌরী স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় দরিদ্র ভিখারীর সংসার ধর্ম থাকা উচিত নয়। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন

নাহি ঘরে সদা খাই খাই।

কি করে গৃহিণীপনে খন খন ঝন ঝনে

আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই॥" (ঐ/৬০)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই পেয়েছি বাঙালী সমাজে নতুন নতুন বৃত্তিধারী জাতির কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে বাণিজ্যবৃত্তির পাশাপাশি চাকুরীজীবী শ্রেণীর উৎপত্তি হতে থাকে, সুতরাং নতুন নতুন বৃত্তিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে এযুগে। বর্ণাশ্রম প্রথার মর্যাদা না থাকলেও উচ্চবর্ণের বর্ণশ্রেষ্ঠতার আত্মম্ভারিতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। পতিনিন্দা অংশে কুলীন কন্যার উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ষাটি।

জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥" (ঐ/ ২৬৪)

ভারতচন্দ্রের সময়কাল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন যুগগত প্রবণতাটি সুন্দরভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন— "ভারতচন্দ্র যখন বাংলা দেশে আবির্ভূত হন, তখন খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পুরাতন যুগকে বিদায় দিয়া নূতন যুগে পদার্পণ করিতেছে; এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কাব্যে যুগের রূপটি ধারণ করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশ হইতে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিল। সাগরপার হইতে আগত বিদেশী বণিক বাংলার শাসনভার অধিকার করিবার সময় আসন্ন হইল। মুসলমান আমলে চাকচিক্যময় বিলাসী সমাজ-সভ্যতার পতনের শেষ ক্ষীয়মাণ দীপ্তি তৎকালীন সমাজের উপর আপনার বিলীয়মান প্রভাবের অন্তিম প্রহর ঘোষণা করিল। অপর পক্ষে ইংরেজ বণিকের অনুগ্রহ-পুষ্ট হইয়া দেশে এক নূতন অভিজাত ধনি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সমাজে তখনও পুরাতন ধারার রেশ রহিয়াছে, কিন্তু ভাঙনের মুখে সমাজের শাসন নাই, চারিদিকে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রবৃত্তির অবারিত উন্মত্ততা রাজত্ব করিতেছে।"[৭] অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব। একালে রাজনৈতিক বিপর্যয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক

বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে ওঠে, শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, জনগণের ধন প্রাণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতে — "মধ্যযুগের নবাবী জীবন-সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারের সমস্তই লক্ষণই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, বাংলা দেশের আর্থিক দুর্গতির এবং সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার সূচনা এই সময়েই দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।"[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার এই অরাজকময় পরিস্থিতিতে ছোট বড় জমিদাররা রাজা নাম ধারণ করে। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন একজন রাজা নামধারী প্রখ্যাত জমিদার। ভারতচন্দ্র এই রাজসভারই আশ্রিত কবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় নানা বিদ্যার অনুশীলন হলেও সেকালের অবক্ষয়ী লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একাধারে দরবারী জীবনের অন্তঃসারশূন্য বিলাস-ব্যসনের বাগাড়ম্বর, অন্যধারে মানুষের নৈতিক চেতনা ও আদর্শবোধের অবসান ঘটেছিল। বস্তুতপক্ষে মোগল দরবার থেকে আগত নৈতিকতা বর্জিত রীতিনীতির অন্ধ অনুসরণের ফলে দেখা গিয়েছিল রুচি বিকৃতি। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সম্রাটের প্রতিপত্তি হানি ঘটলেও কিন্তু জাঁকজমক ও আড়ম্বর কমেনি, বরঞ্চ বলা যেতে পারে অন্তিম প্রহরে প্রদীপ নেভার আগে যেন দপ্ করে জ্বলে উঠে অন্তিম শিখা স্পর্শ করেছিল। আর তারই প্রভাব পড়েছিল সাধারণ নাগরিক জীবনেও। সামগ্রিক বিপর্যয়ের মুখে শোষণে-অত্যাচারে জনসমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে নবাগত ইংরেজি সংস্কৃতি আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রবীণ-নবীনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেণীগত বিভেদ, অর্থনৈতিক বিভেদ উভয় সমাজে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর্থিক বন্টন ব্যবস্থার বৈষম্যে দরিদ্র ক্রমশ দারিদ্র্যের গভীরে নিমজ্জিত আর ধনী আরও ধনী হয়ে উঠেছিল। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ জনসমাজ নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। এ সময় হতচকিত জাতির প্রতিনিধি রূপে শাক্ত সাধকেরা আদ্যাশক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দৈবচেতনা ও ভক্তিবাদের উপর বিশ্বাস রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বহিরঙ্গ জীবনে চাকচিক্য আড়ম্বর সত্ত্বেও মানুষ হয়ে পড়েছিল নিঃস্ব ও রিক্ত।এই জনসমাজ ধর্ম-কেন্দ্রিক কৌম জীবনের পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। এই আত্মকেন্দ্রিকতা গোষ্ঠীবদ্ধ ও পারিবারিক জীবনে ভাঙন ধরিয়েছিল। আধুনিক জীবনের মর্মমূলে যে আত্মকেন্দ্রিকতা রয়েছে তার উৎপত্তি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। এই ভাব-পরিবেশে ভারতচন্দ্র বড় হয়েছিলেন এবং সচক্ষে দেখেও ছিলেন।জীবনের কোন এক সময় প্রচুর কষ্ট সহ্য করলেও যেহেতু তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন, তাই দুঃখ দুর্দশা তাকে স্পর্শ করেনি, কিন্তু রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত হল তা অষ্টাদশ শতাব্দীর কলুষতা মুক্ত হতে পারেনি। একারণেই ভারতচন্দ্র প্রথাসম্মত মঙ্গলকাব্যের কবি হতে পারেননি। যে ভক্তিবাদ মঙ্গলকাব্যের নেপথ্যচারী প্রধান শক্তি ছিল, তা ভারতচন্দ্রের কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতকীয় যুগ-পরিবেশ তথা সামাজিক ইতিহাস সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়েছে। ঘটনা সংস্থাপনে, চরিত্র গঠনে, বর্ণনায় তা পরিস্ফুট হয়েছে। রাজদরবার থেকে আগত বিলাস-ব্যসন জনজীবনকে গ্রাস করেছিল; নৈতিক শিথিলতা, ব্যাভিচার, ভোগবাদ জীবনকে আচ্ছাদিত করেছিল। বিশেষত ধর্মকথার মোড়কে পরিবেশিত হয়েছিল স্থূল ইন্দ্রিয়লিপ্সা ও কামোত্তেজক বর্ণনা, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাগরিক জীবনের বাক্‌পটুতা. অলঙ্কার সর্বস্বতা। ধরা যাক্ 'রতিবিলাপ' অংশটি, ভারতচন্দ্রের রতি প্রেমিকা নয়, কামোন্মাদ চরিত্র।অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে শিবের ধ্যানভঙ্গের প্রয়োজন হয়েছিল দেবসেনাপতির জন্মের প্রয়োজনে, ভারতচন্দ্র সে প্রয়োজন অনুভব করেননি। ভারতচন্দ্র শিবের ধ্যানভঙ্গ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

"বিবাহ করিয়া তাঁহারে লইয়া
আনন্দে কর বিহার।"(ঐ/৩৪)

তাই শিবঠাকুর ধ্যানভঙ্গ হওয়া মাত্র মদনপীড়া অনুভব করে নারীসঙ্গ সন্ধান করে–

"সিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ

নয়ন মিলিলা হর॥

কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত

নেহালেন চারি পাশে ।

সমুখে মদন হাতে শরাসন

মুচকি মুচকি হাসে॥" (ঐ/৩৩-৩৪)

কিংবা, নলকূবরের বৃত্তান্তে তার উক্তিতে এ'যুগের বিকৃত কামচর্চা ও ভোগবাদের প্রসঙ্গ পরিস্ফুট। তাই নলকূবর দেবপূজা করার চাইতে কামচর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করে–

"এ সুখযামিনী এ নব কামিনী

এ আমি নব যুবক।

এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া

ধ্যানে রব যেন বক॥" (ঐ/১৫২)

অষ্টাদশ শতকীয় দরবারী রুচিহীন বিকার প্রধানত নাগরিক জীবনকেই গ্রাস করেছিল, তার অনন্য দৃষ্টান্ত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। ভারতচন্দ্র লেখনীর প্রসাদে আচ্ছাদিত করে পরিবেশন করলেও তার পরিচয় গোপন থাকেনি। বিদ্যাসুন্দরের কামচর্চার নির্লজ্জ বর্ণনা যুগেরই ফসল। এই বিকৃত জীবনযাপন থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও বাদ ছিল না। মালিনী বিদ্যাকে সুন্দরের কাছে ঠেলে দিলে বিদ্যা মালিনীকে তিরস্কার করে বলে -

"বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।

রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥" (ঐ/১৮৮)

এই কামচর্চার মূলে ছিল কর্মশক্তিহীন বিকৃত মানসিকতা, বিলাসিতা, মদ্যপান, গাঁজা-ভাঙ্ সেবনের প্রবণতা। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে সিদ্ধি ঘোটনার ব্যাপক-বিস্তৃত বিবরণ পাই। এই বিকৃত মানসিকতা শুধু ধনীর বিলাসকক্ষেই নয়, ধনীর অন্তঃপুর থেকে সাধারণ জনসমাজেও প্রবেশ করেছিল। তাই ভিখারী শিবের দুই পুত্রের একজন পিতার মত নেশা করে, আরেকজন উপার্জন না করলেও বাবুগিরি করে ('ময়ূরে উড়ায়')। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বাবু সমাজ গড়ে উঠেছিল তার মর্মমূলে শুধুমাত্র ইয়ংবেঙ্গলীদের মদ্যপান প্রবণতাই ছিল না, তার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতকেই।

প্রেম চেতনাগতক্ষেত্রেও অষ্টাদশ শতকে বিকৃতি গ্রাস করেছিল। তাই বৈষ্ণবপদাবলীর রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে নরনারীর বৈবাহিত সম্পর্কে একটা প্রেমের আচ্ছাদন ছিল, তাই মঙ্গলকাব্যের কবিগণ প্রেমিক নারী পুরুষের ছবি তুলেছেন। অষ্টাদশ শতকে বিবাহ বিষয়টির মূলে ছিল বিকৃত কামচিন্তা, তাই বিদ্যাসুন্দরের প্রেম প্রকৃতপক্ষে কামকুন্ড মাত্র। রতিবিলাপে, বসুন্ধর-বসুন্ধরা বা নলকূবরের প্রণয়ে প্রেমের স্পর্শ নেই। জনজীবনে এর প্রভাব কতখানি পড়েছিল তার পরিচয় পাই 'দাসু বাসুর খেদ' অংশে। ভারতচন্দ্রের লেখনীতে জন-মানসিকতা এভাবে প্রকাশ পেয়েছে–

"দিবসে মজুরি করে রজনীতে গিয়া ঘরে

নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।

নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে

তারে বড় কেবা আছে দুখী॥

. . . . . .

কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া

এক দিনো শুতে না পাইনু।" (ঐ/৩০৯)

শুধু তাই নয়, শিববিবাহ সভায় উপস্থিত নারীগণের সংলাপে কিংবা সুন্দরকে দেখে নারীগণের পতিনিন্দা অংশে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের নানা দিক প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের অবনতি হয়েছিল, ধর্মে,চিন্তায়, মানসিকতায়, আচার-আচরণে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগে বাঙালী জমিদারগণ অনেকেই দস্যুদল পালন করত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সার্বিক অবনতিতে সমাজে চোর, ডাকাত, বাটপাড়ের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল, এদের সামাল দিতে শাসকগণ হিমসিম খেয়েছিল। কারাগার চোর ডাকাতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষেত্রে চোর ডাকাতদের হাতে, পায়ে শেকল বেঁধে নগরে ছেড়ে দেওয়া হত। ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুসারে—

"চকের মাঝেতে কোতয়ালি চবুতরা।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায়ে মেগে খায় বাজার বাজার॥" (ঐ/১৬৯)

ছলনা, প্রবঞ্চনা ও জুয়াচুরিতে মানুষ আস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল, বিশেষত বণিকরা সমাজে নিন্দিত হয়ে পড়েছিল। এযুগের সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ তাই ব্যবসায়বৃত্তি গ্রহণে অস্বীকৃত ছিল। তবে সাধারণ মানুষের দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা এবং সততার প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে ঠক্ ও প্রবঞ্চক মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র বণিক নয় শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজসভায় সভাসদ্ থেকে দ্বারী পর্যন্ত সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে খানাদারের উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়–

"ঠক ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার
খরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়ে আছি॥" (ঐ/১৬৭)

নগরের দারোয়ান সুন্দরের নিকট থেকে এক জোড়া ঘোড়া, পাঁচটি হাতিয়ার ঘুষ নিয়ে তবে তাকে রাজসভায় প্রবেশাধিকার দেয়। বণিকদেরও দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যায় হীরা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায়-

"নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥
লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়।
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে॥" (ঐ/১৭৯)

অন্নদামঙ্গলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা মূলত গ্রামীণ জীবন প্রভাবিত, যেখানে মধ্যযুগীয় সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বৃত্তি অনুযায়ী বসতি স্থাপনের কথা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ সংগঠন একটু ভিন্নতর বলে মনে করা যায়। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিদ্যাসুন্দর পালায় 'পুরবর্ণন' অংশে বর্ধমান নগরের যে জনবিন্যাসের চিত্র তুলে ধরেছেন তা সম্পূর্ণ নাগরিক সমাজ। যেখানে জাতি, বর্ণ, বৃত্তি ও ধর্মগত কোন বিভেদ নেই, সকল শ্রেণীর মানুষ নগরে সহাবস্থান করেছে অর্থাৎ এখানে মিশ্র

জনবিন্যাস দেখা যায়। কোন বিশিষ্ট জাতি বা ধর্ম বা বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক বসতি স্থাপন নয়, বরঞ্চ সকল শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়ে বসবাস করেছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে —

"কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক।
সেকড়া ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥" (ঐ/১৭০-১৭১)

লক্ষণীয়, ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় সকল জাতির মানুষ মিশ্রিত হয়ে গেছে। আসলে সমাজ জীবনের অভ্যন্তরে চেতনাগত পরিবর্তনের ফলে এযুগে মানুষে মানুষে পার্থক্য অনেক কমে গিয়েছিল। মানুষের মূল্য খানিকটা হলেও স্বীকৃত হওয়ায় তার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের বাণী শোনা গিয়েছিল।সামগ্রিকভাবে বলা যায় জীবন-জীবিকা ইত্যাদির দ্বারা ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সকল শ্রেণীর মানুষের চরিত্রগত ঐতিহাসিক পরিচয় আমরা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখতে পাই।

মনসামঙ্গলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সংঘর্ষের যে চিত্র পাওয়া যায় কালক্রমে তা সহনশীলতার রূপ পেয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পুনরায় অবনতি ঘটেছিল। হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মতের যেমন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগর সমাজের মধ্যে উৎপাদিত পণ্য বণ্টনের বৈষম্য তীব্র হয়ে উঠলে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভেদ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। যেমন হিন্দুধর্মের শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সহজিয়াপন্থীদের মধ্যে তেমনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের আচরণগত, ব্যবহারগত বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল। হিন্দুর দেবতা ও ক্রিয়াকর্ম যেমন মুসলমান সমাজে হাস্যস্পদ হয়ে উঠেছিল তেমনি মুসলমানদের ধর্মীয় আচারও হিন্দুর কাছে হাস্যস্পদ ছিল। ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে বাদশাহের (জাহাঙ্গীর)কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মুসলমান শাসকের দ্বারা হিন্দুধর্মের উপর যে আঘাতের চিত্র আছে তা ঐতিহাসিক সত্য।আলিবর্দি খান ভ্রাতুষ্পুত্র সৌলদজঙ্গকে কটকের নবাবী দেন, এদিকে মুরাদবাখর সৌলদজঙ্গকে পরাজিত ও বন্দি করেন। আলিবর্দি খাঁর বিজয়ী সৈন্য মহাবদজঙ্গের নেতৃত্বে কটক আক্রমণ করে মুরাদবাখরকে বিতাড়িত করেন এবং তাঁরা বিজিত এলাকা কটকের বিখ্যাত ভুবনেশ্বর মন্দির ধ্বংস করেন। ভারতচন্দ্র এই ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র অঙ্কন করেছেন —

"ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥

ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥"(ঐ/১০)

এভাবে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়া, হিন্দুর জাতি নষ্ট করা ছিল মধ্যযুগে সাধারণ ব্যাপার। মানসিংহ পালায় বাদশাহের সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদারের কথোপকথনে তৎকালীন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত; একে শুধু মাত্র গতানুগতিকতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জাহাঙ্গীর হিন্দুর দেবদেবীকে ভূতের সঙ্গে তুলনা করেছেন, হিন্দুর ধর্মগ্রন্থাদিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন—

"সয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায়।
আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায়।
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥
সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥" (ঐ/৩০৫)

এখানে নিজ ধর্মের আচার-আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। অপরদিকে হিন্দুর কাছেও মুসলমানী আচার-আচারণ ও ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করতে চাওয়া হয়েছে। ভবানন্দ ইসলামের নিরাকারবাদকে বিদ্রুপ করেছে—

"তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥
দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥" (ঐ/৩০৭)

ভারতচন্দ্র দ্রষ্টা মাত্র ছিলেন, যা দেখেছেন নিজে তার মধ্যে না গিয়ে তাঁর কাব্যে চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। হিন্দুসমাজের বিধবা রাখা মুসলমানের কাছে নিন্দনীয় ছিল, অপর দিকে মুসলমানের বিধবাবিবাহ ও তালাক প্রথা হিন্দুর কাছে নিন্দনীয় ছিল।হিন্দুরাও যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করত না তা নয়, অষ্টাদশ শতকেও কবি জাহাঙ্গীর বাদশাকে হিন্দুর দেবীর কাছে নত করেছেন। দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব ঘটলে মুসলমানরা বিপন্ন হয়, এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দুর দেবতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়—

"জাহাঁগীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা॥
জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে।
অন্নপূর্ণাপূজা সবে কর ঘরে ঘরে॥" (ঐ/৩২০)

ভবানন্দের কাল্পনিক কাহিনী রচনা করে ভারতচন্দ্র তৎকালীন ধর্ম কলহের দিকটিকে পরিস্ফুট করেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নয়, হিন্দুসমাজে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব কতটা প্রকটিত হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ব্যাস কাহিনীতে।

ভারতচন্দ্রের যুগ কেবল মাত্র দৈব মুখাপেক্ষী নয়, অর্থাৎ দেববাদ বা ভক্তিবাদের যুগ নয়। সমগ্র মধ্যযুগে সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষ দৈব নির্ভরশীল হয়েই থেকেছে— ততখানি দৈব নির্ভরতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর দেখা যায়নি। অন্নদামঙ্গল কাব্যের ছত্রে ছত্রে মানুষের পৌরুষ ও মনুষ্যত্ববোধের

জাগরণ, ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ দেখা যায়। তাই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেখানে দেবতার সঙ্গে দেবতার বিরোধই মুখ্য হয়ে এসেছে, তার মধ্যে আবর্তিত হয়েছে মানুষ, সেখানে অন্নদামঙ্গলে দেবতা-মানুষ দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়েছে। ব্যাস চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে এই যুগগত পৌরুষ স্ফূর্তিলাভ করেছে। বৈষ্ণব ও শৈব দ্বন্দ্বে বৈষ্ণব ব্যাস স্বয়ং শিবঠাকুরকে অগ্রাহ্য করেছে, আবার শৈব হয়ে বিষ্ণুকে অগ্রাহ্য করেছে এবং শেষ পর্যন্ত আপন সিদ্ধান্তে অটল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। 'ব্যাস গঙ্গা কথোপকথনে' কিংবা 'ব্যাস অন্নদার কথোপকথনে' ব্যাসের উজ্জ্বল পৌরুষ ফুটে উঠেছে। 'ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন' অংশে ব্যাসের পৌরুষোজ্জ্বল উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

"যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন॥" (ঐ/১২৫)

এই মানবীয় শক্তি চেতনাই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগধর্ম। তাইতো মানুষ দৈবানুগ্রাহী না হয়ে "Do or Die" নীতি গ্রহণ করেছে, আর মানুষের কামনা-বাসনা অর্থাৎ বলিষ্ঠ ভোগবাদই প্রধান্যলাভ করেছে। ভারতচন্দ্র তাইতো সামাজিক রীতিনীতি, দেবভক্তিকে উপেক্ষা করে নরনারীর বলিষ্ঠ সম্ভোগ চিত্র অঙ্কন করেছেন কাব্যের বিভিন্ন অংশে। তাই সতী, মহাদেব, গৌরী, কার্তিক, নলকুবর ও নলকুবর পত্নী, ব্যাস, বিদ্যা, সুন্দর এমন কি ঈশ্বরী পাটনী পর্যন্ত পার্থিব ভোগবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছে।ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনার মধ্যে এই বলিষ্ঠতা প্রকাশিত। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দৈবানুগৃহীত মানুষ যেখানে শেষ পর্যন্ত কাতর, সেখানে ভারতচন্দ্র দেবীর কাছে সকাতর নন। ঈশ্বরী পাটনীও দেবীর কাছে কাতর নয়, এমন কি দেবীর পরিচয় পেয়ে ঈশ্বরীর কোন ভাব পরিবর্তন হয়নি। এযুগের মানুষ দৈবানুগ্রহের চাইতে নিজের কর্মতৎপরতায় আস্থা স্থাপন করেছিল, ফলে দৈবপ্রাপ্তি অপেক্ষা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল। সুন্দর বিদ্যার রূপ-গুণের কথা শুনে তাকে লাভ করার জন্য বর্ধমান যাত্রা করে। তার বলিষ্ঠ উক্তি—

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥" (ঐ/১৬৪)

ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের দ্বারা ভারতচন্দ্র বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের কাব্যের বিষয়বস্তু ও বিন্যাস লক্ষ করলে যুগগত পরিবর্তনের ইতিহাস বোঝা সম্ভব।

রাজনৈতিক চালচিত্র ঃ অষ্টাদশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ঘনঘটাময়; ভারতচন্দ্রের কাব্যে সে সময়কার রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ছবি পাওয়া যায়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের আমলে আমীর-ওমরাহগণই রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তি স্বার্থের কারণে মোগল উত্তরাধিকারীগণ মগ্ন থাকলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। বাংলার ছোট ছোট জমিদাররা 'রাজা' নাম গ্রহণ করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। এ পর্বের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস আসলে এক বিভগ্নতার ইতিহাস। ভারতচন্দ্র এ সকল ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলি প্রত্যক্ষ করে ছিলেন, এবং তার বিবরণ দিয়েছেন অন্নদামঙ্গল কাব্যে। ভারতচন্দ্র যখন অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন আলিবর্দি খান। ইতিপূর্বে মুর্শিদকুলি খানের সময়ে বাংলা স্বাধীন সুবায় পরিণত হয়।আলিবর্দি বিচক্ষণ শাসক হলেও তাঁর রাজত্বকাল নিষ্কন্টক ছিল না। মুর্শিদকুলি খানের জামাতা সুজাউদ্দীন এবং সরফরাজ খান বাংলার শাসক হলে তাঁদের দেওয়ান ছিলেন আলমচন্দ্র রায় রাঁয়া। সেকালে মুসলমান নবাবদের 'খান ই খানান' ইত্যাদি উপাধি থাকত। হিন্দু জমিদার ও রাজাগণ তার অনুকরণে 'রায় ই রাঁয়ান' বা 'রায়রাঁয়া' উপাধি নিতেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে-

"সুজা খাঁ নবাবসুত সরফ্‌রাজ খাঁ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া॥" (ঐ/১০)

সে সময়ে আলিবর্দি খান পাটনার নবাব ছিলেন। আলিবর্দি খান মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার নবাব হন; তখন থেকেই বাংলায় আলিবর্দি খানের রাজত্ব শুরু। আর অন্যদিকে আলিবর্দি কটক আক্রমণ করে মুর্শিদকুলি খানকে বিতারিত করে ভাইপো সৌলদজঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতচন্দ্রের বিবরণ অনুযায়ী—

"ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব॥
কটকে মুরসীদ্ কুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥ (ঐ)

কিছুকাল পরে সুজাউদ্দীনের আত্মীয় মুরাদবাখর কটক আক্রমণ করে সৌলদজঙ্গকে বিতারিত ও কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু আলিবর্দি এতে ক্রুদ্ধ হয়ে কটক আক্রমণ করেন এবং মুরাদবাখরকে পরাজিত করে সৌলদজঙ্গকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আলিবর্দি খান উড়িষ্যা আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা চালান। ভারতচন্দ্রের বিবরণ অনুসারে—

"নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে॥
লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া।" (ঐ)

বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে যখন অরাজকতা বিরাজ করছিল তখন বাংলার রাজনৈতিক জীবনে আরো একটি আঘাত হানল মারাঠা বর্গীর আক্রমণ। মারাঠা বর্গীরা চৌথ আদায়ের নামে প্রায় দশ বছর বাংলার জনগণের উপর নিপীড়ন চালায়। ভারতচন্দ্রের বিবরণ অনুযায়ী আলিবর্দির সৈন্য-সামন্তরা উড়িষ্যার পুরী ও ভুবনেশ্বর মন্দির লুন্ঠনের দ্বারা হিন্দুধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিল। তাছাড়া হিন্দু রাজা, জমিদার ও সামন্তগণ দীর্ঘকাল মুসলমান রাজশক্তির হাতে উৎপীড়িত হওয়ায় তারা প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিলেন। এই ঘটনাকে ভারতচন্দ্র বর্ণনা করেছেন—

"আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন॥" (ঐ/১১)

কিন্তু কার্যত প্রথমত আশ্বাস পেলেও বর্গীয় অত্যাচারে সে ভরসা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। বর্গীরা বাংলার গ্রাম কে গ্রাম লুন্ঠন করে, হত্যালীলা, অগ্নিসংযোগ, গৃহদাহ এমন কি নারী লুন্ঠনের মত ঘৃণ্যতম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে বাংলার গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়—

"লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।

গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
... ...
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥" (ঐ)

কবি গঙ্গারাম বিরচিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' কাব্যে, তাছাড়া সে সময়কার বহু পণ্ডিতের বিবরণে বর্গী আক্রমণ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। সেকালে রচিত প্রচলিত গ্রাম্য ছড়ায় বর্গী আক্রমণের ভয়াবহতার বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালের বাঙালীর খাজনা যোগাবার সামর্থ ছিল না। সমাজে তখন শাসনের পরিবর্তে শুধু শোষণ বিরাজিত ছিল, কেননা রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। জনৈক সমালোচকের ভাষায় – "প্রজাসাধারণের বিন্দু বিন্দু চোখের জল রৌপ্যচক্রে পরিণত হয়ে নবাবের বিলাস-বাসনা চরিতার্থতা করেছে।"[৭] ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত ছোট বড় জমিদার , রাজা মহারাজাগণ কর ভারে জর্জরিত হন, আলিবর্দি খান কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট থেকে বারো লক্ষ টাকা নজরানা দাবী করেন। ইতিমধ্যে বর্গী আক্রমণ ঘটলে প্রজার ধন-প্রাণ নাশ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র কর দিতে অপরাগ হলে আলিবর্দি তাকে বন্দি করে রাখেন। বর্গীরা নবাবকেও কিছু দিন মুর্শিদাবাদে আবদ্ধ করে রাখে। ভারতচন্দ্রের বিবরণ অনুযায়ী —

"মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ।
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন।
বদ্ধ করি রাখিলেক মুরশিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥ (ঐ)

এই সময়ে বর্গী আক্রমণের ফলে আলিবর্দি তাঁর পরিবারবর্গ সহ মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করার সংকল্প করেছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের জননী বর্ধমান ছেড়ে মূলাজোড়ে বসবাস শুরু করেছিলেন।[৮] ভারতচন্দ্রের জীবনী পাঠে জানা যায় সেকালের সামন্ততান্ত্রিক শাসনের কুফলের কথা। এ সমস্ত কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা ও প্রজা শোষণ-নিপীড়নের বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র রামদেব নাগের যে নিপীড়ন চিত্র তুলে ধরেছেন তা সামন্ততান্ত্রিক শাসনেরই ফলশ্রুতি। সামন্ত ভূস্বামীগণ আফগান, রাজপুত, পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ রূপে এবং এদের সাহায্যে প্রজা শোষণ করত। দরবারী জীবনের নানান অপকর্মের সহায়কও ছিল এরা, ফলে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। সেকালের বিত্তবান লোকেরা গ্রামের বাইরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান নগরাঞ্চলে বসবাস করত। বর্ধমান, কোলকাতা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এই নগরগুলিই ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসনের কর্মকেন্দ্র। চাকুরী, ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির কারণে শিক্ষিত বণিক সম্প্রদায় এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা নগরাঞ্চলে বসবাস করত। প্রজার নিকট থেকে আদায়কৃত রাজস্বের অধিকাংশই রাজদরবারের বিলাস-ব্যসনে ব্যয় হত। অন্যদিকে জমিদার ও বণিক সম্প্রদায় মুসলমান নবাবের সমর্থন পেয়ে যথেষ্ঠ ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েছিল এবং অস্তায়মান দরবারী জীবনের অন্ধ অনুকরণে চাক্‌চিক্যময় বিলাস-ব্যসনে নিয়োজিত হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের মানুষরা নবাবী পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনুগ্রহের

ফলে মুসলমানি সংস্কৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল।নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা এর বাইরে ছিল না। বস্তুত সর্বত্র অনৈতিকতা, প্রাণহীনতা, বাগাড়ম্বর প্রাধান্যলাভ করেছিল; আর তারই অর্থ জোগাতে প্রজারা কর ভারে জর্জরিত হয়। সেকালের ছোট-বড় রাজা মহারাজাগণ সাহিত্য, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তবে তার মূলে ছিল রাজসভা অলঙ্কৃত করার বাসনা, ঐশ্বর্য, বিলাসবহুলতা ও রাজকীয় দর্পের ঘোষণা করার মানসিকতা। কোন আদর্শবোধ বা বৃহত্তর মানব কল্যাণের নিমিত্ত তাঁরা আত্মনিয়োগ করেননি। এছাড়াও তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক কূটনীতি, রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে এঁরাই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুত ইংরেজের বুনিয়াদ এদেশে সুদৃঢ় করতে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে ইঁহারা সকলেই এত জড়িত ছিলেন, নিজেদের স্বার্থ-অন্বেষণে এত ব্যাপৃত ছিলেন যে, দেশের এই চরম দুর্গতির দিনেও জনসাধারণের কথা ভাবিবার অবসর বা ইচ্ছা তাঁহাদের ছিলনা। যে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহারা করিতেন, তাহা তাঁহাদেরই ধর্ম্ম, আদর্শ ও রুচির প্রতিফলন দেখিবার জন্য, এবং সেই রুচি একান্তভাবে ক্ষীয়মাণ সামন্ততন্ত্রের বিলাসব্যসন-লিপ্ত, আত্মরতিময়, ভোগ-প্রমত্ত স্থূল রুচি।"* এ সময় যে দরবারী জীবন গড়ে উঠেছিল এবং তাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তাতে দরবারী জীবনের রুচির পরিচয় আছে। সেকালের রাজা-মহারাজার যে রাজদরবার থাকত তাতে মূলত সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বৈরাচারীতা ও স্বজনপোষণ নীতি দেখা যেত। রাজসভায় রাজার প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পদ সকলই রাজা বা জমিদারদের আত্মীয়স্বজনরা ভোগ করতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যাঁরা শোভাবর্দ্ধন করতেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর আত্মীয়-পরিজন। তাছাড়া সেখানে কিছু শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তিরা স্থান পেতেন । অবশ্য হিন্দু রাজদরবারেও মুসলমান কর্মচারী থাকত; সম্ভবত মুসলমানরা সেনাবাহিনী ও নিম্নশ্রেণীর রাজকর্মচারীর পদ পেতেন। হিন্দু রাজা বা জমিদারের রাজসভায় গণক, বৈদ্য, ভাঁড়, সভাকবি, দেওয়ান, বক্সী, মুন্শী, গায়ক,নর্তক, ঘড়ীয়াল, খানেজাদ, সিপাহী, জমাদার, আমীন, পেশকার, কানুনগো ইত্যাদি রাজকর্মচারী থাকত। হিন্দু রাজার রাজসভায় মুসলমানি রাজদরবারের আদলে কিছু কিছু পদ সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন- হাবশী, মনসবদার ইত্যাদি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড়ের মত ভাঁড়, হাস্যার্ণব ভাদুড়ী মহাশয়, রসিকপ্রবর কেনারাম মুখোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ রায়, চাঁদ রায়, শুকদেব রায়, কালিদাস সিদ্ধান্ত, কন্দর্প সিদ্ধান্তের মত পণ্ডিত সভাসদ ও পারিষদ ছিলেন, এঁরা সবাই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাছাড়াও ছিলেন গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি, বৈদ্য প্রধান গোবিন্দরাম রায়, জগন্নাথ রায়, দেয়ান গোপাল চক্রবর্তী, রায়বক্সী মদনগোপাল, মুনশী কিঙ্কর লাহিড়ী, গোবিন্দ লাহিড়ী, কালোয়াত গায়ক বিশ্রাম খাঁ, নর্তক শের মামুদ, বিদ্যাধর খোষালচন্দ্র, জমাদার মামুদ জাফর, তীরন্দাজ মুজঃফর হুসেন, হাজারি পঞ্চম সিংহ, আমীন নীলকন্ঠ রায়, দেয়ানের পেশকার বিশ্বনাথ বসু, হাবসী ইমামবক্স প্রমুখ। এছাড়াও ভোজপুরী, সোয়ার, বুন্দেলা, মাল প্রভৃতি নানা জাতি নানা ধর্মের কর্মচারীগণ রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন।

অর্থনৈতিক চালচিত্র ঃ অষ্টাদশ শতকেও বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি; যদিও শিল্প ও বাণিজ্য ধীরে ধীরে মানুষের জীবিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছিল। তাছাড়া অষ্টাদশ শতকে চাকুরীজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। অন্নদামঙ্গল কাব্যে আমরা সেকালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় পেতে পারি।

মোগল আমল থেকেই এদেশে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল; ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা চালু থাকলেও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে মুদ্রা ব্যাবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রা চালু থাকলেও রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার ব্যবহারই বেশী ছিল। মুদ্রা ব্যবস্থার নিম্নতম মান হিসাবে কড়ি ব্যবহারের কথা পাওয়া যায় অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে এবং অষ্টাদশ শতকে রচিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে হীরা মালিনীর বেসাতি অংশে, কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিমলা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায় কড়ি

ব্যবহারের উল্লেখ পাই। বাজারে কড়ির মূল্য ওঠানামা করত, ফলে দৈনন্দিন জীবনে ক্রয়-বিক্রয়ে অসুবিধা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাজারে খাঁটি মুদ্রার পরিবর্তে মেকী মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই মেকী মুদ্রার কথা পাওয়া যায়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দর হীরা মালিনীকে বাজার খরচের জন্য দশ টাকা দিলে হীরা মালিনী সেই টাকা লুকিয়ে মেকী টাকার ব্যবহার করে—

"সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।" (ঐ/১৭৮)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাজারে পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রকার 'সিক্কা' টাকার প্রচলন ছিল। পুরাতন টাকার পরিবর্তে নতুন টাকা নিতে গেলে 'বাট্টা' দিতে হত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এবং কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল কাব্যে পুরাতন টাকার পরিবর্তে নতুন টাকার 'বাট্টা' প্রদানের চিত্র পাই। মোহরের প্রচলন এসময় প্রায় ছিল না, তবে রাজা-মহারাজারাই সাধারণত মোহর ব্যবহার করত। তাই সুন্দর বিমলা মালিনীকে মোহর দিলে সে অবাক হয়েছে। কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিমলা মালিনী সুন্দরকে বলেছে—

"পাছে বুঝ মাসি কিছু করিয়াছে চাপা।
কোথায় এমন টাকা পাইয়া ছিলা বাপা॥
মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি।
সিক্কা সিক্কা কাটিল মণত বাট্টা কমি।
বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত।
থোকে ছয় তঙ্কার বণিক দ্রব্য জাত॥" (কৃষ্ণরাম/৩০)

অন্নদামঙ্গলে অচল টাকা বা খোঁটা টাকার ব্যবহারের কথাও পাওয়া যায়। এসব অপ্রচলিত বা অচল টাকা ভাঙ্গিয়ে নিতে বাট্টা দিতে হত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তারও উল্লেখ পাই। হীরা মালিনী সুন্দরকে বলেছে—

"বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥" (ভারতচন্দ্র/১৮০)

অচল টাকা বা সিক্কা টাকার বাট্টা বদলের বাজার ওঠানামা করত। বিমলা মালিনী তাই বলেছে-

"তবে থাকে টাকা দেড় ভাঙ্গাইতে চাই।
আগুন লাগিল কড়ি বড় কম পাই॥"(কৃষ্ণরাম/৩০)

এর ফলে বাজার ফেরত ব্যক্তির হিসাব দেওয়া অসুবিধা হত। বিমলা মালিনী সুন্দরকে হিসাব দিতে গিয়ে তাই হিম্‌সিম্ খেয়েছে—

"লিখিয়া খুজুরা দ্রব্য বুঝ কতগুলা।
আমার খরচ এই ছয় বুড়ির তুলা॥
গণ্ডা দশ বারো কড়ি পড়িয়াছে ভুল।
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল॥"(ঐ/৩১)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'আড়কাট' নামে এক প্রকার মুদ্রা ব্যবহারের কথা পাই। একালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের টাকশালে মুদ্রিত মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। আড়কটের নবাবের টাকশালে মুদ্রিত মুদ্রাকে 'আড়কাট' বা আড়কট বলা হত।[১০] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে এবং রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আড়কাট মুদ্রা প্রচলনের কথা পাওয়া যায়। সেকালে প্রচলিত এরকম বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রাকে সিক্কা টাকায় বদল করে নিতে হত এবং এর জন্য

উচ্চহারে বাট্টা দিতে হত। ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীর বেসাতি প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।" (ভারতচন্দ্র/১৭৮)

টাকাপয়সার বা কড়ি গণনার জন্য কিংবা জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য বিভিন্ন রকম একক ব্যবহার করা হত। কড়ি গণনায় গণ্ডা, পণ, কাহন ইত্যাদি একক ব্যবহার করা হত। আবার গুণতি করা জিনিস, যেমন— পান, সুপারি পণ বা কাহন হিসাবে বিক্রিত হত। চাল, ডাল, চিনির মত দ্রব্যাদি সের হিসাবে পরিমাপ চলত। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় তার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। যেমন—

"তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি ।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
.....
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥" (ঐ/১৮০)

সেরের এক চতুর্থাংশকে 'পোয়া' বলা হত। 'পোয়া' হিসাবেও জিনিসপত্র পরিমাপ হত। কৃষ্ণরামের কাব্যে পাই-

"কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।
প্রলয় পড়িল পোয়া সাড়ে সাত বুড়ি।" (কৃষ্ণরাম/৩১)

কাঠ বা শাকের মত দ্রব্যগুলি 'আটি' হিসাবে পরিমাপ হত এবং বাজারে বিক্রি হত।ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাই—

"আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি।" (ভারতচন্দ্র/১৮১)

কৃষি ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর এবং প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল ধান। কৃষকেরা অন্য ফসলের চাইতে ধান চাষে গুরুত্ব দিত এবং বাংলার উর্বর ভূমিতে প্রচুর ধান উৎপন্ন হত। প্রধানত তিন প্রকার ধানের চাষ হত বাংলাদেশে, এগুলি হল— আউশ, আমন এবং বোরো।ভারতচন্দ্রের বর্ণনায়—

"মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আসু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে॥" (ঐ/৩৪২)

তবে মোটা-সরু, স্বাদে-গন্ধে, আকৃতি-প্রকৃতিতে তিন প্রকার ধানের জাত ছিল অনেক প্রকারের। কৃষ্ণরাম দাসের 'কমলামঙ্গল' কাব্যে বিভিন্ন প্রকার ধানের উল্লেখ পাই , যথা— ধান্যমুড়ি, পারিজাত, কল্পলতা, নাউচিকে, পদ্মদল, বগড়া, ঘিকলা, গঙ্গাজল, সূর্যভোগ, কালিনী, গুয়াশালী, নিসিন্দি, চন্দ্রমণি, জগন্নাথশালী, হেঁউড়্যা, চড়ুইনেচা, কলামচা, কামিনী, জেইন্দি, জামাইনাড়ু, কিয়া, মউলতা, কৃষ্ণকেলী, মাটিচালি, সীতাশালী, খয়েরশালী, রাজমহিষী, বেন্যাবউ, হরগৌরী, রত্নমালি, পাতরা, কর্পূরশালী, কামরাঙ্গা, বেনাফুল, কনকচূর মালতী, সোয়ালতা, রত্নশালী, কেসুরকলি, সুয়াশালী, নীলাবতী, দুধকলম, শীতলজিরা, কমলামোহন, গুনফুলি, মরীচশালী, আকই, পানিকলস, শীতলজটা, দুগ্ধভোগ, এপানিকলস, পাতামল, গুয়াথুপি, গন্ধশালী, ঝিঙ্গাশালী, কালোজিরে, শঙ্খনাদ, মধুতুলসী, রোসন ইত্যাদি শতাধিক জাতের ধানের নাম।" ভারতচন্দ্রের কাব্যেও বিভিন্ন প্রকার ধানের নাম পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুসারে—

"দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা।
কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুদি।
শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী॥
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার॥
দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলে জিরা পদ্মরাজ দুদসার লুচি॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥
বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল।
কাজলা শক্করচিনা চিনিসমতুল॥
মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গন্দাজল মুনিমন হরে॥
সুধা দুধকলম খড়িকামুটি রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্ধে॥
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী।
কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে॥
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু॥" (ঐ/৩৪২)

ধান ছাড়াও পাট, শন, তিল, সরিষা, আখ, বাজরা, চিনা; বিভিন্ন প্রকার ডাল– মুগ, মসুর, মাষ, অড়হর, ছোলা, মটর ইত্যাদি; তাছাড়া যব ও গমের চাষ হত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে তার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যের রন্ধন তালিকায় পাওয়া যায় এসমস্ত দানাশস্যের কথা।তাছাড়া কার্পাস, তামাক, রেশম চাষ হত; বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি— লাউ, কুমড়ো, বেগুন, মূলা ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার ফল, যথা— কলা, আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল, তাল, বেল, জামির, চালতা, তেঁতুল, কুল, আমড়া, আনারস ইত্যাদি উৎপন্ন হত। তাছাড়া প্রচুর পান ও সুপারি উৎপন্ন হত। বিভিন্ন প্রকার মসলা — হলুদ, লঙ্কা, আদা, জিরা, রসুন, লবঙ্গ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এসবের প্রচুর উল্লেখের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যের সুলভতার কথা অনুমান করা যায় ।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীনালা খালবিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন প্রকার মাছের প্রচুর ব্যবহার ও নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। মাছ বাঙালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য। মাছ কাঁচা ও শুকনো উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হত। বাংলাদেশের ভূমিতে সোনার ফসল ফললেও লোকে অনেক সময় চাষে উৎসাহিত হত না, কারণ কৃষকরা জমিদার মহাজনদের দ্বারা ক্রমাগত শোষিত হত। শিবায়নে কৃষক সমাজের শোচনীয় চিত্র ফুটে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিক জাতির উত্থানের কথা থাকলেও অধিকাংশ মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত হত না, কারণ ধর্মভীরু বাঙালী প্রবঞ্চনার পেশাকে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। তাই কৃষিই ছিল গ্রাম বাংলার সমাজ-অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ।

শিল্প ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতিতে কৃষির পরেই শিল্পের স্থান ছিল। সেকালে ক্ষুদ্রশিল্পের যথেষ্ট প্রসার ছিল।ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে— বস্ত্রশিল্প, স্বর্ণশিল্প, লৌহশিল্প, কাঠ-বাঁশ ও বেতের শিল্প ইত্যাদি প্রধান। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বণিকদের হাতে কাঁচা পয়সা এসেছিল। পেশাজীবী মানুষরা কাঁচা পয়সার লোভে শহরমুখী হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে দেখা যায় বণিক ও শিল্পীরা নগরবাসী। কালকেতুর গুজরাট নগরে পেশাজীবী মানুষের আগমন চিত্র থেকেও একথা অনুমান করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকে শিল্পী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নগরবাসী হয়ে পড়েছিল। এ শতকে বাংলার বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল এবং তার চাহিদাও ছিল ব্যাপক। বাংলার তাঁতিরা শ্রীরাম, মেঘডম্বর,বাঘাম্বর, তসর, বুটিদার ইত্যাদি শাড়ী তৈরী করত, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার উল্লেখ আছে। রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে বা ঢাকাই বুটিদার বস্ত্রের বিশেষত্বের কথা আছে—

"বনাত মখ্‌মল পটু ভূষণাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাশা॥"[১২]

বাংলার মেয়েরা কাপড় তৈরীর জন্য তুলা থেকে সুতা কাটত; কুলীন-অকুলীন পরিবারের মেয়েরা সুতা কাটার অর্থে জীবিকা নির্বাহ করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কুলীন কন্যার সুতা কাটার কথা আছে।

'গোর্খবিজয়' কাব্যে এক নারীর উক্তিতেও সুতা কেটে জীবিকা নির্বাহের কথা পাই। যেমন—

"আহ্মারে কাটিমু সূতি তুহ্মি যে বুনিবা ধুতি
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি।
দিনে দিনে বেশ হইব সম্পদ বাড়িআ যাইব
তবে জাইব কাথা আর ঝুলি॥"[১৩]

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাংলার বিভিন্ন শিল্পের প্রচুর বর্ণনা আছে। অষ্টাদশ শতকে শিল্পেরক্ষেত্রে অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল। বর্গী আক্রমণ, দস্যুভয় ও শাসকের শোষণের ফলে দেশীয় শিল্পের অবনতি দেখা দেয়।ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাই তৎকালীন দেশীয় শিল্পকর্মের বিবরণ খুব বেশী নেই।

বাণিজ্য ঃ মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল ছাড়া পরবর্তীকালে যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল তাতে বণিক সম্প্রদায় ও তাদের বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ নেই। ধরা যেতে পারে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী বৈদেশিক বাণিজ্যযাত্রার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েছিল। মুহম্মদ আবদুল জলিল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মোগল আমলের কিছুটা পূর্ব থেকেই বাঙালী বণিকেরা বহির্বাণিজ্য ছেড়ে অন্তর্বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেছিল। কারণ সুলতানি যুগের শেষপর্বে মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বে গৌড়ের সিংহাসন টালমাটাল তখন পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। গৌড়ের শাসকের এই উপদ্রব দমনের ক্ষমতা ছিল না বরং তারা পর্তুগীজ দস্যুদের ভয় করত। তৎকালীন গৌড়েশ্বর মামুদ শাহের সাহায্যে পর্তুগীজরা এদেশে বাণিজ্য কুঠী নির্মাণ করে এবং এদেশীয় বহির্বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভ করে।[১৪] বাংলার বণিকরাও তৎকালীন পর্তুগীজদের বহির্বাণিজ্যের দৌলতে লাভবান হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় তৎকালীন বণিকগণ ঘরে বসেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে তার সাক্ষ্য আছে। আসলে এই পর্বে বহির্বাণিজ্য বিদেশী বণিকদের হাতে চলে গিয়েছিল। বাংলার দ্রব্য তারাই বিক্রয় করত আর দেশীয় বণিকগণ অন্তর্বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছিল। বিদেশী বণিকগণ বাংলার সস্তা দ্রব্য কাঁচা পয়সায় কিনে নিত এবং চড়া দামে বিক্রি করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেশবিদেশ থেকে আগত এই বণিকদের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের গড় বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।

সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥

. . . . . .

ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটাআঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা ॥
সেই গড়ে নানাজাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন।"(ভারতচন্দ্র/১৬৮)

ভারতচন্দ্র শুধু বৈদেশিক বণিকদের কথাই বলেননি, ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশের বণিকদের কথাও বলেছেন—

"দ্বিতীয় গড়েতে দেখ যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান ॥
তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে ॥" (ঐ)

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক দুরবস্থা এবং পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচারের ফলে বাংলার কৃষি ও শিল্পের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অবনতি হয়েছিল। মধ্যযুগে নগর সংলগ্ন এলাকায় বাজার গড়ে উঠেছিল। যেখানে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচাকেনা করত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমান, কৃষ্ণনগরের মত নগর এলাকার পাশে বাজারের চিত্র পাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে হীরা মালিনীর বেসাতি কিংবা কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে বিমলা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায় বাজারের চিত্র আছে। রামপ্রসাদ সেন তৎকালীন বর্ধমান নগরের বাজারের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তাতে অধিকাংশই বিদেশী বণিকরা দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করে বিদেশে চালান দিচ্ছে আর তার পরিবর্তে বিদেশী দ্রব্য আমদানি করছে।[১৫] একালে বাংলার বস্ত্রশিল্প, অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্প ও বাণিজ্য বর্গীর আক্রমণ, দস্যুর উৎপাতের ফলে ধ্বংস হয়েছিল, অপরদিকে বাজারের মালিক ও জমিদারদের অতিরিক্ত কর ভার চাপিয়ে দেবার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনসাধারণের দুর্গতির অন্ত ছিল না। অন্নদামঙ্গলে হীরা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায় তার কিছু পরিচয় আছে । দস্যুদের উৎপাত ও লুণ্ঠন অনায়াসভাবে চলত, ফলে তাঁতি, শিল্পী, বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় এক প্রকার বন্ধ করেই দিয়েছিল। বাঙালী সমাজে সাধারণ মানুষ ব্যাবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিছু বৃত্তিজীবী মানুষ নিজের উৎপাদন স্থানীয় বাজারে বিক্রি করত। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস'; কিন্তু ধর্মভীরু বাঙালীর কাছে বাণিজ্যবৃত্তি গ্রহণীয় ছিল না। তাই কৃষিজীবী বাঙালী শিবঠাকুর কৃষিকাজই আরম্ভ করেছিল। ভারতচন্দ্রের গৌরী কিন্তু শিবঠাকুরকে বাণিজ্যের পরামর্শ দিয়েছে, কেননা শুধুমাত্র চাষবাসের দ্বারা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব ছিল না। তাই গৌরীর অভিমত —

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।"(ঐ/৬০)

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে চাকুরীবৃত্তি বা 'রাজসেবা' ততখানি গ্রহণযোগ্য হয়নি। রামেশ্বরের কাব্যেও দেখা যায় ব্রাহ্মণের চাকুরীবৃত্তি স্বীকৃত ছিল না। কেননা জাতিগত অভিমান পরিত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখি 'রাজসেবা' বা চাকুরীবৃত্তি 'খচমচ' মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।সেকালে রাজা বা জমিদারের সেনাবাহিনী ও উচ্চপদস্থ রাজপদে, যথা— দেওয়ান, আমীন, পেশকার বিভিন্ন পদে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষরা চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করত। ভারতচন্দ্র স্বয়ং চাকুরীবৃত্তি গ্রহণের জন্য ফারসী ভাষা শিখেছিলেন।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের

প্রভূত উন্নতির ফলে অর্থনৈতিক জীবনে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার সুফল ভোগ করেছিল সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষ— বণিক সমাজ, জমিদার, মহাজন, সামন্তরাজ ও রাজকর্মচারীগণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত কম থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্দশা কম ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল ও ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন বাংলাদেশের জনজীবনের ঐশ্বর্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ছবি আছে। এমন কি আলিবর্দি খাঁর সময়কালে বর্গী আক্রমণ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, তা সত্ত্বেও অল্পকালের মধ্যেই জনজীবনে সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ফিরে আসে। রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বর্ধমান নগরের জনজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। কবির বর্ণনায়-

"স্বচ্ছন্দ সকল লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক
নাহি কোন অধর্মের লেশ।"[১১৬]

বস্তুতপক্ষে, অষ্টাদশ শতকে রাজদরবার ও নগরজীবনের যে সমৃদ্ধির কথা পাওয়া যায়, রাজদরবার ও নগর সংলগ্ন বাজারের যে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা ছিল মুষ্ঠিমেয় রাজসভাসদ্ ও অভিজাতবর্গের ভোগ্য। ভূস্বামী ও বণিক সম্প্রদায় নবাব ও ইংরেজ বণিকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে প্রতিপত্তিশালী ও অপর্যাপ্ত বিত্ত লাভ করেছিল, পক্ষান্তরে সাধারণ জনজীবন ছিল অন্ধকারময়। সাম্প্রদায়িক শ্রেণীগত ভেদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও গভীরভাবে প্রকটিত হয়, তার কারণ উৎপাদিত অর্থ বণ্টনের বৈষম্য এবং সাধারণ জনজীবনে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যেও তার পরিচয় আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কৃষি ও বাণিজ্যের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থে সমৃদ্ধ হলেও অল্পকালের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়।শাসকের শোষণ-পীড়নে, কর ভারে গ্রামীণ জনজীবন ন্যুব্জ হয়ে পড়ে।অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই ভগ্ন আর্থিক অবস্থার কথাই পাওয়া যায়।

কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মানুষ কৃষিকেই আশ্রয় করেছিল। কৃষিতে শাসক ও মহাজনের থাবা প্রসারিত থাকলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিজাতদ্রব্যের অভাব হয়তে ছিল না, কিন্তু কৃষি বিনষ্ট হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যথা—চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, চিনি, ময়দা বাজারে মহার্ঘ হয়ে ওঠে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির কথা আছে। হীরা মালিনী বাজারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বলেছে—

"মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥" (ভারতচন্দ্র/১৮১)

কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিমলা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায় তৈজসপত্রের মহার্ঘতার পরিচয় পাওয়া যায়।শুধু তাই নয়, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বাজার দর বৃদ্ধি পেত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও দ্রব্যের মানগুণ কিন্তু হ্রাস পেয়েছিল। কৃষ্ণরামের বর্ণনানুসারে—

"ঘৃতের দোকানে দেখি এত কেন চোক।
ঠেলাঠেলি গণ্ডগোল গায়ে গায়ে লোক॥
কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।
প্রলয় পড়িল পোয়া সাড়ে সাত বুড়ি॥
বিবাহ অনেক ঠাঞি কর্ণবেধ কারো।
দ্রব্যের দর তাই বাড়িয়াছে আরো॥
পশিতে নারিলাম গুয়া পরশের বাড়া।
পোণেকে দুই পোণ সেহ নহে ছাড়া॥
যেন তেন ছাঁচের আছয়ে এক গুণ।

সবে মাত্র বাজারে সুলভ আছে চুন॥" (কৃষ্ণরাম/৩১)

লক্ষণীয় বিষয়, মধ্যযুগের কাব্যে যে দ্রব্যমূল্য তালিকা পাওয়া যাচ্ছে তা অত্যন্ত কম; দৈনন্দিন তৈজসপত্রের সহজলভ্যতা এতে অনুমেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের খুব স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, কারণ তাদের ক্রয় ক্ষমতা অত্যন্ত কম ছিল। ধন বন্টন ব্যবস্থার অসাম্যের ফলে দ্রব্যমূল্য কম সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না। অন্নবস্ত্রহীন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের চিত্র কম নেই এযুগের সাহিত্যে। তার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হরিহোড় জননী পদ্মিনী। ঘুঁটে বিক্রি করা তার জীবিকা অর্থাৎ এযুগের বিপর্যস্ত অর্থনীতিতে মানুষ ন্যূনতম জীবিকা আশ্রয় করেছিল, তাই পদ্মিনীর পরিধানে পদ্মপাতার আচ্ছাদন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি॥ (ভারতচন্দ্র/১৩৯)

হরিহোড়ের জীবিকা ঘুঁটে বিক্রয় করা এবং বহু সংখ্যক মানুষ এভাবে জীবিকা নির্বাহ করত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে স্ত্রীর ন্যূনতম শাঁখা পরার শখ পূরণের ক্ষমতা শিবঠাকুরের মত সাধারণ মানুষের ছিল না। অন্নদামঙ্গলে সাধারণ অন্নবস্ত্র জোগানোর ক্ষমতাও মানুষের নেই। হরিহোড়ের উক্তিতে একথা স্পষ্ট—

ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে।
.....
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।" (ঐ/১৪৩)

সাধারণ অন্নবস্ত্র ছিল মহার্ঘ, তাতে অতিথির আগমন হলে মানুষের দুর্দশার এক শেষ হত। বর্গী আক্রমণের পরবর্তীকালে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। পরবর্তীকালে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল তার বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচ ও ছয়ের দশকে। ক্রমাগত বিপর্যয়ের ফলে এক শ্রেণীর দরিদ্র মানুষ ভিখারীতে পরিণত হয়েছিল। শিবায়নে যে শিব কৃষিকার্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা খুঁজেছিল সেই শিব ভারতচন্দ্রের যুগে আবার ভিখারীতে পরিণত হয়েছিল। ভিক্ষা চাইবার লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু ভিক্ষা দেবার মত লোক ছিল না; কেননা সকলের ঘরে অন্নাভাব। তাইতো শিবঠাকুর যেদিকে যায় সেদিকে শুধু অন্নাভাব। কবির ভাষায়—

"যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥" (ঐ/৬৫)

ঘরে ঘরে অন্নের জন্য কাতরতা, হাহাকার ও ক্রন্দনধ্বনি। ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুসারে—

"কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥" (ঐ/৬৬)

সমাজ মানসের সকরুণ আর্তি ভারতচন্দ্রের কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। সাধারণ মানুষের জীবনে অন্নের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছুই ছিল না। কোন রকমে কায়ক্লেশে মোটা ভাত-কাপড়ে বেঁচে থাকাই মানুষের একমাত্র কাম্য ছিল, তাই দেবীকে কাছে পেয়েও ঈশ্বরী পাটনীর মত অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ ধন-রত্ন-মণি-মুক্তার পরিবর্তে খেয়েপড়ে বেঁচে থাকা প্রার্থনা করেছে এবং সন্তানের জন্যও ঐ একই কামনা করেছে। ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনা—

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। " (ঐ/১৫৯)

এছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কৃষি ও বাণিজ্যে লব্ধ অর্থের দ্বারা যারা ঐশ্বর্যবান হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ ও অত্যাচারে কৃষি ও বাণিজ্য নষ্ট হলে তাদেরও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে, ফলে তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না।সমাজের অপেক্ষাকৃত ধনীরাও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাইতো ভারতচন্দ্রের শিবঠাকুর বলেছে—

"লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই॥
. . . . . .
অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ॥" (ঐ/৬৬-৬৭)

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর বিশেষত্ব হল হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া, ধন ও ঐশ্বর্য দান করা। কিন্তু ভারতচন্দ্রের দেবী অন্নপূর্ণা হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দেবার দেবী নয়, সে নিখিল জনের অন্নদাত্রী দেবী।একদিন সমাজ ইতিহাসের তাগিদ থেকে সাধারণ মানুষ অমঙ্গলকারী দেবীকে হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। অন্নদামঙ্গলের পরিকল্পনার পিছনে আর্থসামাজিক প্রয়োজন ছিল বেশী। নিরন্ন মানুষ অন্নের তাগিদে অন্নপূর্ণার আরাধনা করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে অর্থ কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফলে মানুষ অন্নপূর্ণা অর্থাৎ মুদ্রাদেবীর আরাধনা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে 'মুদ্রাদেবী' বলেছেন সে হল ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা। তাইতো ভারতচন্দ্র এযুগের মানুষের অর্থনৈতিক চালচিত্র সম্পর্কে মোক্ষম কথা বলেছেন— দেবী অন্নপূর্ণার পূজা করলে কি হবে? ভারতচন্দ্রের দেবীর উক্তিতে—

"আমার পূজার ফলে বড় সুখের রবে।
মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে॥" (ঐ/১৪৫)

মুদ্রাই মানুষকে সামাজিক প্রতিপত্তি, মান ও কৌলীন্য দিয়েছে। অর্থ কৌলীন্যের জোরেই নীচু শ্রেণীর লোকের কৌলীন্য প্রাপ্তি এযুগের অন্যতম বিশেষত্ব বলে মনে করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক শ্রেণীর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। রাজসেবা অর্থাৎ চাকুরীবৃত্তি সমাজে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা না পেলেও এক শ্রেণীর মানুষ চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ করে অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। ধনী জমিদার বা রাজা-মহারাজাদের সেনাবাহিনীতে সৈন্যবৃত্তি বা রাজসভায় বিভিন্ন বৃত্তিতে মানুষ নিযুক্ত হত। তাছাড়াও সমাজে নতুন নতুন বৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল, একালের নতুন বৃত্তিগুলি হল— মুন্‌শী. বখশী, উকিল. আরজবেগী. খাজাঞ্চি, পোদ্দার. হিসাবের মুহুরী. নিকাশের মুহুরী. বাজে জমাদার. দপ্তরী. ঘড়েল ইত্যাদি। এই সমস্ত বৃত্তিধারী মানুষরা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল মধ্যসত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের মূলে এই শ্রেণীর মানুষরা ছিল। বাংলাদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা হলে চাকুরী বৃত্তিজীবী শ্রেণীর অর্থাগমের পথ আরও সুগম হয়।

ধর্মজীবন ঃ বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হলে হিন্দুধর্ম ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য

শাসিত হিন্দুসমাজ সেদিন হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষার মানসে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। নানা রকম পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হিন্দু সমাজপতিদিগকে সেদিন এগিয়ে চলতে হয়েছিল। বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাঙালীর হিন্দুধর্মে অবনমন দেখা গিয়েছিল, মধ্যযুগের সাহিত্যে তার পরিচয় আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত তান্ত্রিক ধর্ম পুনরায় প্রসারলাভ করতে থাকে। এই পর্বে বৈষ্ণবধর্ম ও শাক্তধর্মের বিরোধের ভাব অনেক হ্রাস পায়।[১৭] কেননা শাক্ত সাধকগণ কৃষ্ণ ও কালীকে একাকার করে দেখেন। শুধু তাই নয়, রামপ্রসাদ সেনের সাধনায় কালী, কৃষ্ণ, শিব ও রাম এক হয়ে গিয়েছিল—

"ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম
সকল আবার এলোকেশী।
বিশ্বরূপে ধর সিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী
ওমা রাম রূপে ধর ধেনু
কালী রূপে করে অসি॥"[১৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শৈবধর্ম আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ফেলেছিল। সমগ্র মধ্যযুগে শৈবধর্মের স্থলে শাক্তধর্মের প্রতিষ্ঠা হতে দেখা যায়। জীর্ণ শৈবধর্ম ও সমাজের উপরে শাক্তধর্মের প্রলেপ পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে শৈবধর্ম পুনরায় নতুনভাবে জাগরিত হবার প্রয়াস পায় কিন্তু শৈবধর্ম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বৈষ্ণবধর্ম ও ইসলামের প্রভাবে শৈবধর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে; এই পর্বের সাহিত্যে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। শিবকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মঙ্গল সাহিত্য রচিত হলেও শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এই পর্বে বৈষ্ণব-শৈব দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যাস কাহিনীতে বৈষ্ণব ও শৈবের দ্বন্দ্ব দেখা যায় তার পূর্বাভাস রচিত হয়েছে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে। তবে এর মধ্যেও প্রাচীন শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠার ক্ষীণ লক্ষণ দেখা যায় রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে লৌকিক শিবের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়ে চলেছিল এবং কালক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব অর্থাৎ শিব ও বিষ্ণুকে এক আসনে বসিয়ে পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন-"পরবর্তী বাংলার সমাজে লৌকিক শৈব ধর্ম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ক্রমে বাংলার হিন্দু সমাজে লৌকিক শিবের প্রাধান্য একেবারে লোপ পাইতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনের যে স্তর হইতে লৌকিক শিবের জন্ম হইয়াছিল, তাহা হইতে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন ক্রমে অনেক উর্ধ্বে আসিয়া উপনীত হইল। সেইজন্য বাংলার প্রাচীনতম সমাজ হইতে জাত দেবচরিত্রসমূহ পরবর্তী বাংলার উন্নততর সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইল না। ইতিমধ্যে সমাজের সকল স্তরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কার্যকর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ফলে শিবের পার্শ্বে নারায়ণের সিংহাসন স্থাপিত হইয়া গিয়াছে।"[১৯] অষ্টাদশ শতকে ভক্তিবাদ বা যুক্তিবাদ কোনটাই সমাজে সম্ভব ছিল না। তাই ভক্তিবাদের স্থানে দেখা গিয়েছিল ধর্মকলহের বাগাড়ম্বর, তবে স্থির বিশ্বাস কোন ধর্মের মধ্যেই ছিল না, তাই ব্যাসদেব বৈষ্ণব রূপে শিব নিন্দা এবং শৈব রূপে বৈষ্ণব নিন্দা করেছে। ভারতচন্দ্র ব্যাসের এই ধর্মধ্বজী স্বরূপ সম্পর্কে শিবের উক্তিতে বলেছেন—

"দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥" (ভারতচন্দ্র/১০০)

সেকালের কবিগণ সমাজ ইতিহাসের এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁরা কাব্যে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। এই সূত্র ধরেই শিবের সঙ্গে নারায়ণের অভেদত্বের কথা বলা হয়েছিল। কখনো কখনো শিব ও নারায়ণকে এক আসনে বসাতে গিয়ে লৌকিক শিবের গা থেকে গ্রাম্য উপকরণগুলি সরিয়ে হরি ও হরকে

সমন্বিতরূপে প্রকাশ করা হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শিব কাহিনীতে শিবের এই রূপই প্রকটিত। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের শিব চরিত্র ঠিক বৈদিক রুদ্রও নয় আবার মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত লৌকিক শিবও নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কতকগুলি শিবমাহাত্ম্যসূচক এবং বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক পুরাণকাহিনী সংযোজনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন আদর্শ থেকে আগত দেবচরিত্রগুলির সমন্বয় সাধন করে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে দেবতার এই মূর্তিই রচিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাই বিষ্ণুকে নিন্দার জন্য শিব স্বয়ং নন্দীকে উপদেশ দিয়েছে—

"মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥" (ঐ/১০০-১০১)

আবার বিষ্ণু ভক্ত ব্যাস শিব নিন্দা করলে স্বয়ং বিষ্ণু ব্যাসকে এই বিভেদের জন্য তিরস্কার করে-

"যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাববলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥(ঐ/৯৮-৯৯)

অর্থাৎ এক দেবতার পূজা করে অন্য দেবতার অবহেলা করলে কোন দেবতার পূজা সফল হয় না। বাঙালী হিন্দুরা স্বভাবত পঞ্চোপাসক, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় তাদের আস্থা— অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দুর ধর্মগত আদর্শ এরূপ সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায় নয়, হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম সম্প্রদায় এই সমন্বয়ের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল, সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর এই সম্মিলিত দেবমূর্তি। হিন্দুর হরি মুসলমানের ফকির রূপে অবতার গ্রহণ করে। 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা'য় ভারতচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান ধর্ম সমন্বয়ের এই আদর্শ গ্রহণ করেছেন। এখানে কবি লিখেছেন—

"কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান্।
ফকির শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান॥(ঐ/৩৯১)

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আদর্শ থেকে এই শ্রেণীর সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। এই আদর্শ সমাজ মানসে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল তা বলা শক্ত, তবে উভয় শ্রেণীর মানুষকে নাড়া দিয়েছিল বলেই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যেও এই আদর্শের প্রচার দেখা যায়।

এযুগের সমাজ মানসে নিষ্কলুষ ভক্তিভাবের জায়গায় স্থান গ্রহণ করেছিল অবিশ্বাস, আড়ম্বরপ্রিয়তা ও জৌলুস। দেবদ্বিজে মানুষের নিষ্ঠা ও ভক্তি তিরোহিত হয়েছিল। তাইতো ভারতচন্দ্র দেবতাকে নিয়ে খেলা করেছেন, তামাশা করেছেন। যে মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা মূলে ভয়-ভক্তি কাজ করেছিল, কবি ভয়ে হোক ভক্তিতে হোক দেবতার স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য করে দেবদেবীর যশোগাথা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন; ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবীর প্রতি সেই আস্থা ও ভক্তি নেই। প্রথাগত রীতি অনুযায়ী দেব বন্দনা করলেও সেখানে ভক্তির চন্দন তিলক নেই। ভারতচন্দ্র কাব্যে চৈতন্য বন্দনা করেননি। সম্ভবত পোষ্টা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত বলে তাঁর মন রক্ষার জন্য চৈতন্য বন্দনা করেননি। ভারতচন্দ্র ব্যক্তি জীবনের এক পর্বে সন্ন্যাসী হয়েও তার সারবত্তা খুঁজে পাননি, ফলে পুনরায় গৃহধর্ম গ্রহণ করেন। দেবী অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের আনুগত্য ও ভক্তি অন্নদাতা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় কাব্য রচনা করেন— দেবীর আজ্ঞায় নয়। তাই দেবী সরাসরি ভারতচন্দ্রকে কাব্য রচনার নির্দেশ দিতে পারেনি অর্থাৎ দেবীর ইচ্ছা হলেও কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি ভিন্ন ভারতচন্দ্র কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন না। তাই দেবী মাতৃসুলভ বিনয়ে ভারতচন্দ্রকে বলেছে—

"অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥"(ঐ/১৪)

এযুগে দেবতার প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ দেবতাকে নিজ খামখেয়ালী ও আপন স্বার্থ প্রতিপূরণে ব্যবহার করতে চেয়েছে। অইতো দেখা যায় ব্যাসদেব বারবার দেবতাকে খেয়াল খুশী মত রদবদল করে নিয়েছে। বিষ্ণুকে ছেড়ে শিবকে গ্রহণ করেছে, আবার বৈষ্ণবীয় বেশভূষা পরিত্যাগ করে শৈবধর্মের আচার গ্রহণ করেছে, কারণ বিষ্ণু তার আকাঙ্ক্ষা প্রতিপূরণে সমর্থ হয়নি। তাই ব্যাসের ক্রোধ —

"বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন
কিঞ্চিৎ যোগ্যতা তার নাই॥" (ঐ/১১২)

মানুষ দেবতার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল এভাবে। আর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দেবীকে মানুষ তার অপকর্মের সহায়ক করে তুলেছে। আসলে মানুষ ধর্ম অপেক্ষা কামনা-বাসনা, স্বার্থ ও ক্ষুধাকে বুঝেছিল। ক্ষুধার্ত ব্যাস কাশীবাসীকে অভিশাপ দিয়েছিল, কারণ শিব ব্যাসের ভিক্ষা বন্ধ করেছিল। অন্নপূর্ণা শিবকে তাই বলেছিল—

"এখনো যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায়॥" (ঐ/১০৪)

'পেটের জ্বালা'র মূল্য বুঝেছিল বলেই ঈশ্বরী পাটনী ভক্তি-মুক্তি-মোক্ষ না চেয়ে সামান্য পার্থিব প্রার্থনা করেছিল। সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, বার-ব্রত অবশ্যই প্রচলিত ছিল, কিন্তু মানুষের কাছে এসব আচারের খুব একটা মূল্য ছিল না। তাইতো অন্নপূর্ণার ব্রততিথি অপেক্ষা সুখ ও কামনার মূল্য বেশী। তাই বসুন্ধর বলেছিল—

"অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে
যে সুখ পাইবে রতিসুখে।" (ঐ/১৩৫)

কাঞ্চনমূল্য সমাজে স্বীকৃত হওয়ায় অর্থের মানদণ্ডে সবকিছু স্থির হতে শুরু করেছিল। তাই নলকূবরের সদর্প উক্তি—

"জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন কতেক তেমন।

আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥" (ঐ/১৫২)

সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে যেখানে দেবতা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এযুগে দেবতাও মানুষের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছে। তাই মানুষের কাছে দেবতার পরাজয়। অন্নপূর্ণাকে তাই মানুষের মূল্য স্বীকার করতে হয়েছে। শিবকে অন্নপূর্না বলেছে—

"কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে॥" (ঐ/১০৪)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ এক নব মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা।

ভারতচন্দ্র ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি কতখানি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলেন তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ বর্ণনায়। ভারতচন্দ্রের ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করেছে—

"হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মূতিছে।"(ঐ/২৪)

বস্তুত কোন মঙ্গলকাব্যের কবি ধর্মাচরণের প্রতি এত তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে পারেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমাজ সংস্কার , ধর্ম সম্পর্কে উদাসীনতা, ধর্ম সংস্কার এবং সমন্বয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরুষ তো বটেই নারীও তার আদর্শ ও মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছিল। পুরুষরা নারীকে ভোগের সামগ্রী রূপে দেখতেই অভ্যস্ত ছিল। এযুগের নারীও যেন পুরুষের চরিত্রহীনতার প্রতিশোধ স্বরূপ চরিত্রহীনা হয়ে পড়ে, দেহ সম্ভোগের জন্য পরপুরুষকে প্রলুব্ধ করে। অন্নদামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দরের দেহ সম্ভোগের চিত্রে, নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনায় বাঙালী নারীর সতীত্ব, নমনীয়তা, সংযম ও সহনশীলতার অভাব দেখা যায়। আর একারণেই রামপ্রসাদের মত সাধক কবিও যুগরুচির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিদ্যাসুন্দরের মত অশ্লীল কাব্য রচনা করেন। আসলে বিদ্যাসুন্দরের কামলীলা বর্ণনায় সুন্দরের সুড়ঙ্গ খনন সমাজ মানসের চরম অবনমন সূচিত করে। পুরুষ চরিত্র নারী অপেক্ষা আরও হীন ছিল। দেবতাকেও মানুষ তার ভোগোন্মত্ততার সহায়ক হিসাবে ব্যাবহার করেছে। ধর্মীয় তত্ত্ব দর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা করে নিজেদের স্খলনের সহায়ক রূপে ব্যবহার করেছে। এসমস্ত বিবরণ অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ ইতিহাসের নির্মম সত্য।

বাঙালীর আচরণগত পরিচয়, নামকরণগত পরিচয় অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায়। যেমন বিবাহ সভায় এয়োদের আচরণ, বর দেখতে আগত স্ত্রীদের আচরণ বাঙালীর নিজস্ব। আবার নামকরণেরক্ষেত্রে দেবতার নামেই সন্তানের নামকরণ করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার পরিবর্তে লৌকিক নামকরণ করতে দেখা যায়, এর দ্বারা দেবতার প্রতি ও ধর্মের প্রতি মানুষের অনাস্থা প্রকাশিত।

তথ্যপঞ্জী

১. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ভূমিকা অংশ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, পৃঃ ২২।

২. ঐ , পৃঃ ২২।

৩. ঐ ,পৃঃ ২৩।

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১২০।

৫. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৯৩-৭৯৪।

৬. ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪।

৭. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, অধ্যাপক কার্তিক ভদ্র সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ, পৃঃ ৩।

৮. ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮।

৯. ঐ, পৃঃ ৭।

১০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৬২।

১১. কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ৩০৪-৩০৫।

১২. রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতি সংস্করণ, পৃঃ ৮।

১৩. গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশ, পৃঃ ৪৫।

১৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৭০-১৭২।

১৫. ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩।

১৬. রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৭।

১৭. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৩৪।

১৮. রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতি সংস্করণ, পৃঃ ২২।

১৯. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৪৪-২৪৫।